এগারো-ই ফাল্গুন

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক - শ্রী পাঁচুগোপাল দাস
কমলা পাবলিশিং হাউস
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পাঁচ সিকা

মাঘ, ১৩৪৪

প্রিন্টার - শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার দিদিমা

শ্রীযুক্তা মানদা দেবী

পূজনীয়াসু—

এই

লেখকের

খ্যাতনামা উপন্যাস

"অস্তাচল"

সরস্বতী —

এগারো-ই ফাল্গুন

৯ —

১৪৮০

অল্পে ঝড় উঠে না; কিন্তু এবার এমন একটা ঘূর্ণি পাক-খাইয়া উঠিল যে, শত চেষ্টা করিয়াও মহিম শান্ত হইতে পারিল না। একদিন অবিচলিতভাবে জগতের সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া যখন মৃত্যুযাত্রীর পিছুটানের বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়াছিল, তখন সতীনাথের মুখে সোয়াস্তির আনন্দ দেখিয়া মন গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আজ সরোজিনীর দারুণ কঠোরতা তাহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। মহিম কোনমতেই সমস্যার জাল কাটিয়া উঠিতে পারে না। নিজের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ বুঝিলেও, মুক্ত হইবার কোন সহজ পথ নাই। প্রতিশ্রুতি রাখিতে গেলে দুর্ব্বলতা ছাড়িতে হয়; অথচ তাহাতে যেন সে আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

আলোটা একটু কমাইয়া মহিম জানালার পাশে আসিয়া বসিল। আপনাকে লইয়া সে কখনো এমন বিব্রত হইয়া পড়ে নাই। এই তুচ্ছ কারণে যে মানুষ এতো উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে, সে ধারণাও তাহার ছিল না।

৪

রাত্রি প্রায় একটা। নিতান্ত অসহায়-মনে মহিম আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

লম্বা চুলগুলিকে নিজেই কখন আঙুল চালাইয়া খাড়া করিয়া দিয়াছে। প্রশস্ত কপালের স্ফীত শিরাকয়টি স্বল্প আলোকেও স্পষ্ট দেখা যায়। চেহারায় অন্তরের বিপ্লব যেন অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাতের বই ও পেন্সিল কখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, খেয়াল নাই। চাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে সমাধানের একটা পথ সে চায়।

তটিনী চুপি চুপি ঘরের মধ্যে আসিয়াছিল: মহিম জানিতে পারে নাই। সহসা তাহার চমক ভাঙিল, যখন পিঠের কাছে আসিয়া সকৌতুকে বলিয়া উঠিল—"কি ঠাকুর-পো, কবি থেকে যে একবারে পূরো দার্শনিক হ'য়ে উঠ্‌লে! খাওয়া-দাওয়ার কথা বুঝি সব ভুলেই গেছ? রাত দুপুর গড়িয়ে চ'ল্‌লো।"

নিতান্ত অপ্রতিভের মত মহিম বৌদির মুখপানে চাহিল। তিনি বুঝি তখনো খাবার লইয়া জাগিতেছিলেন!

মহিমের মনের অবস্থা তটিনীর কাছে অনেকখানি ধরা পড়িয়া গেল। সে নিজেও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। বৌদির কাছে তাহার কোন সঙ্কোচ ছিল না। তটিনী বৌদি হইলেও বয়সে ছোট।

একটু খোঁচা দিয়া তটিনী হাসিয়া বলিল—"ভাব্‌ছিলাম—তুমি প'ড়ছ বসে' বসে'। 'ল'এর ফাইন্যাল এক্‌জামিন্ এবার দিতেই হবে ব'ল্‌ছিলে। আর সময়ও নাই বেশী। কিন্তু এসে দেখি—ওমা, একদম্ উল্টো!"

মহিম ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতেও যেন মানসিক বিপ্লবের রেশ জড়াইয়া আছে।

—"না বৌদি, পরীক্ষা আর এখন দেওয়া হবে—সে আশা নাই। মনের ভিতর এবার এমনিতে যে একজামিনের লড়াই সুরু হ'য়ে গেছে, তার ধাক্কা সামলানোই সব চেয়ে কঠিন হবে। তুমি তো সমস্তই জানো বৌদি! কি যে ক'রবো, ভেবে পাই না। মনটা ভিতরে ভিতরে এতখানি এগিয়েছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়—তা নিজেও কোনদিন বুঝ্‌তে পারি নি। এমন কি, রমলাকে নিয়ে যে জীবনে কখনো সমস্যা উঠ্‌বে, তা ভাব্‌তেও পারি নি। বুঝ্‌লাম সেই দিন, যে-দিন কাকাবাবুর ছোট্ট একটা কথার ছোঁয়াচ লেগে বুকের ভিতর অনেক-কিছু তর্‌-তর্‌ করে' গ'ড়ে উঠ্‌লো। নইলে, তার আগে যা কোনোদিন ভেবেছিলাম ব'লেও মনে হয় না, আজ যাকে সেই দিকে হাত বাড়াতে দেখে অন্তর আমার সত্যি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে বৌদি।—" একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া মহিম আপনমনেই বলিয়া চলিল—

"পিগ্‌ম্যালিয়নের পাগ্‌লামির কথা শুনে' আগে কেবল বিদ্রূপের হাসিই হেসেছি। যক্ষের বিলাপ প'ড়ে মনে হ'য়েছে—কতকগুলো অবাস্তব উচ্ছ্বাসের ছবি। কিন্তু আজ নিজের বুকে যে আগুন কেঁপে কেঁপে জ্বলে উঠ্‌ছে, তাতে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—ওই আগুনে পৃথিবী পর্য্যন্ত পুড়ে' ছাই হ'য়ে যেতে পারে। মানুষকে পাবার জন্যে মানুষের যে নেশাটাকে এতদিন শুধু পাগ্‌লামি ব'লে মনে ক'রতাম, আজ মনে হ'চ্ছে সেটা ধুয়ে' মুছে ফেল্‌বার চেষ্টা করাই বোধহয় আরো বেশী পাগ্‌লামি।"

৬

উচ্ছ্বাসের মুখে মহিম এতকথা বলিয়া ফেলিল যে, তটিনীর সঙ্গে তাহার সারাজীবনের কথার সমষ্টিকেও হয়তো ছাড়াইয়া গেল। বৌদির সঙ্গে অবাধে আলাপ করিবার সুযোগ-সুবাদ থাকিলেও, মহিম স্বাভাবিক অল্পভাষিতা কখনো তাঁহার কাছেও ভাঙিয়া ফেলে নাই। আজ এক নিঃশ্বাসে সে যত কথা বলিয়া গেল, তটিনী তার অনেক কিছুই জানিত; তবুও মহিমের অবস্থা বুঝিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল। মহিমকে পথ বলিয়া দিবার মত যোগ্যতা তটিনীর ছিল না।

তটিনী কোনো উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মহিম পিতার পত্রখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। চিঠির কথা তটিনী জানিত না। আজ প্রায় দুই বৎসরের অধিক মণিশঙ্কর রাজমহল ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম-প্রথম প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চিঠি-পত্র লিখিতেন, কিন্তু ইদানীং এক প্রকার বন্ধই করিয়াছিলেন। সংসারের বাঁধন হইতে যেন মণিশঙ্কর ক্রমে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তটিনী তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। ভাবিয়াছিল—তিনি কোন উত্তরই দিবেন না, তাই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পত্রখানি হাতে পাইয়া, তটিনীর মনে অনেকখানি আশা হইল।

'বাবা মহিম,

............জীবনের খুঁটি-নাটি ও সমস্যা বুঝবার যোগ্যতা যতদিন তোমার হয় নি, ততদিন তোমায় কোলের কাছে

রেখেছিলাম। তুমি যোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটি নিয়েছি। তোমাদের সংসারের কথায় আর নূতন ক'রে জড়িয়ে পড়'বার ইচ্ছা আমার নাই। যাক্, তবুও তোমার প্রশ্নের উত্তর আমায় দিতেই হবে, কারণ আমি পিতা। সংসারের পথে পা বাড়াতে হ'লে বাধা-বিপত্তি আসে অনেক। মন তাতে প্রায় পিছিয়ে যেতে চায়। কিন্তু চায় ব'লেই তাকে পিছিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়াটা পৌরুষ নয়। তোমার সমস্যার উত্তর দিতে আমারও ঠিক সাহস হ'চ্ছে না। কি জানি কোন্‌টার ওজন বেশী হবে! তবে একথা তোমায় জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি যে, সত্যকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ যদি কখনো কঠোরতা অবলম্বন ক'রতে বাধ্য হয়, সেই কঠোরতার অপরাধ তাকে নীচের দিকে ঠেলে দেয় না; বরং সাম্‌নের পথে এগিয়ে চ'ল্‌বারই সাহস বাড়িয়ে তোলে। আর, যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত জান্‌তে চাও, তা হ'লে ব'ল্‌বো: যাকে তুমি সত্যবদ্ধ হ'য়ে গ্রহণ ক'রেছ, আমার জীবনেও মস্ত বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল—তাকে তোমার জন্য চয়ন করা। অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনের শেষ ইচ্ছা আমার কাছে এসে অনুমোদন ছাড়া বাধা পাবে না। সতীনাথকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, তাই একদিন তাকে সুখী ক'র্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেছি। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। থাক্, সে সব কথা আর এখন তুল্‌বার ইচ্ছা নাই। যা ভালো বুঝ্‌বে তাই ক'রো। তটিনী-মাকে আমার কথা ব'লো। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ নিও।'

তটিনীর চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মণিশঙ্করের কথাগুলি যে তাহার বুকের কোন্ তন্ত্রীটিকে স্পর্শ করিল, তাহা মহিম বুঝিল না। সে তখনো অন্যমনস্ক।

একটু সংযত হইয়া মণিশঙ্করের পত্রখানি মহিমের সম্মুখে রাখিয়া তটিনী জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর-পো, বাবা যা লিখেছেন তাতেও কি তোমার পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না?"

"পথের ইঙ্গিত তো পাওয়া যায় বৌদি, কিন্তু পাথেয় বোধহয় তেমন পাওয়া যায় না।"

—উদাস দৃষ্টিতে মহিম তটিনীর মুখপানে চাহিল।

'হয় তো তা-ই'—

তবুও তটিনী একটু জোরের সঙ্গে বলিল—"কিন্তু ভেবে দেখ্‌বার আছে ঠাকুর-পো! বাবা কোনো কথা ভেঙে না লিখ্‌লেও, তাঁর ইচ্ছার আভাস সম্পূর্ণই দিয়েছেন। আমার মনে হয়—শুধু সেইটুকু অবলম্বন ক'রেই জগতে অনেক-কিছু করা চলে।"

মহিম নীরব রহিল। এ কথার কোনো উত্তর সে সহসা দিতে পারিল না। তাহার মন বোধহয় তখন ক্ষিপ্রহস্তে তটিনীর কথা কয়টিকে জীবনের উপর আঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। একদিকে সুনীল সুন্দর আকাশের গায়ে ভোরের আলোর বিচিত্র রঙ, অন্যদিকে ফেনিল ক্রুদ্ধ সমুদ্রের বুকে অপটু দু'খানি চঞ্চল ভেলা।

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া, হঠাৎ তটিনীর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া মহিম বলিল—"ঠিক ব'লেছ বৌদি, তা-ই ক'রবো।"

—"তা-ই ক'রো। তোমার মত লোকের অত উতলা হওয়া শোভা পায় না। আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে, যা ভাল বুঝ্‌বে তাই ক'র্‌বে। এত সামান্য কারণে তোমায় অধীর হ'তে দেখ্‌লে,

আমার সত্যি খুব কষ্ট হয় ঠাকুর-পো। পুরুষমানুষ অমনি টুন্‌কো হ'লে কি চলে ?"

"কিন্তু—"

"এতে কিন্তুর কিছু নাই ঠাকুর-পো। আমি জানি যে, তোমার এই সমস্যার ভিতর আমার স্বার্থ কারো চেয়ে কম নয়, তবুও আমি তোমাকে ওই কথাই ব'লবো। যাক্, সে পরে হবে। এখন খাবে চল ; রাত্রি হ'য়ে গেছে অনেক।"

"চ-ল"। মহিম সুবোধ ছেলেটীর মত তটিনীর পিছু পিছু চলিল। এমনি করিয়া কাহারো পরিচালনায় আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর হইতে আকাশে গাঢ় হইয়া মেঘ জমিয়াছিল; কিছুক্ষণ হইল, অল্প অল্প বৃষ্টি নামিয়াছে।

তটিনী চলিয়া গেলে, মহিম বারান্দায় আসিয়া বসিল। পাছে বৌদি ঠাণ্ডা লাগার অভিযোগ তুলিয়া বিরক্ত করিতে আসেন, তাই আলোটি সে পূর্ব্বেই নিভাইয়া দিয়াছিল। বর্ষা দেখিতে মহিম চিরদিন ভালবাসে। বাদলের সাড়া পাইয়া সে আর বদ্ধঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারিল না। অন্ধকার ঘরের ভিতরটা যেন দুশ্চিন্তার নিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিছুক্ষণ বাহিরে বসিয়া, মহিমের মন আপনা-আপনি কতকটা শান্ত হইয়া আসিল ; বৃষ্টির শব্দে অনেকখানি উদ্বেগ যেন চাপা পড়িয়া গেল। সম্মুখের আম-বাগানটা বর্ষার স্পর্শে গভীর রাত্রের

স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টির আঘাতে পাতায় পাতায় যে ঝর্ ঝর্ শব্দের গান বাজিয়া উঠিয়াছিল, মহিম একমনে তাহাই শুনিতে লাগিল। পৃথিবীর বুকের উপর প্রকৃতি অলক্ষ্যে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়; কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে তাহার সুর যখন বাজিয়া উঠে, আপন-ভোলা ছুটিয়া বাহির হয়: সেই সুরের স্পর্শে নিজের বুকখানিকে ভরিয়া লইবার নেশায়। মানুষকে সে ভুলিয়া যায়; আকাশ তাহাকে হাতছানি দেয়, সিক্ত মাটির গন্ধ তাহাকে মাতাল করিয়া তোলে; নদী পথ দেখাইয়া আগে আগে ছুটিয়া চলে; আবার পাখী সিস্ দিয়া পিছু ডাকে। কিন্তু, সে বাধা মানে না। রক্ত মাংসের দেনা-পাওনা ভুলিয়া সহসা সেই আকাশ-বাতাসে-ঘেরা মাটিকে সে ভালবাসিয়া ফেলে। এই মাটিই তাহার দেশ।

তটিনীর দরজার কাছে আসিয়া মহিম আস্তে আস্তে ডাকিল "বৌদি!"

মহিমের ডাক শুনিয়া, তটিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঠাকুর-পো! কী ব'ল্ছ?"

তটিনীর ব্যগ্রতাটুকু লক্ষ্য করিয়া মহিম হাসিয়া বলিল—"অত ব্যস্ত হবার কিছু নাই বৌদি! আমার ওয়াটার-প্রুফটা একবার নেব ব'লে এসেছি।"

মহিমের কথায় তটিনী অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল।—"সে কি ঠাকুর-পো, পাগল হ'লে নাকি? একে শীতের শেষ রাত্রি, গায়ে কাপড় না জড়িয়ে ঘরের মধ্যেই থাকা যাচ্ছে না, তাঁর উপর ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে; এখন কোথায় বেরোবে বল তো? শেষে কি কঠিন রকম একটা অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে ব'স্‌বে?"

"অসুখ-বিসুখ বাধাবো না বৌদি! বরং সেগুলোকে জয় ক'রবো ব'লেই ঠিক করেছি এবার।"

মহিম অল্প হাসিল।

তটিনী কোনো উত্তর দিল না। অবাক্ হইয়া মহিমের মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, মহিম অনুনয়ের সুরে বলিল—"দাও না বৌদি! এর পর হয়তো বৃষ্টি থেমে যাবে; তখন আর বেরোনো হবে না।"

মহিমের দৃঢ়তা তটিনী ভাল করিয়াই জানে। একবার সে যাহা ধরিয়াছে তাহা হইতে ফিরানো অসম্ভব। তবুও তটিনী বাধা দিয়া বলিল—"না ঠাকুর-পো, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমার কোনোমতেই বাইরে যাওয়া হবে না। আমি বর্ষাতি বের ক'রে দেব' না। রাত প্রায় দুটো, তা খেয়াল আছে? আর এই ভীষণ অন্ধকার!"

কিন্তু মহিম কোনোমতেই বাধা মানিল না। অগত্যা বিরক্তির সঙ্গে তাহার ওয়াটার-প্রুফ্‌টা বাহির করিয়া দিয়া, তটিনী গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাওয়া হবে শুনি?"

"অন্য কোথাও নয় বৌদি; এই আমবনের ভিতর একটু

বেড়িয়ে আসবো। ভারি চমৎকার লাগ্‌বে। বাগানটার ভিতর যেন বৃষ্টির নাচন লেগে গেছে।”

মহিম হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মহিমকে একটু খোঁচা দিবার উদ্দেশ্যে তটিনী তাহাকে শুনাইয়া বলিল—“চাও কি, ওবাড়ী পর্য্যন্তও যেতে পার। ভালবাসায় মানুষ পাগল হয় না ঠাকুর-পো; পাগল হয়—অতৃপ্ত খিদেয়।”

দম্‌কা হাওয়ায় পাশের ঝাউ গাছটা সাঁ সাঁ শব্দে দুলিতেছিল। তটিনীর বুকের ভিতর ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

রমলা ও কাকীমার খবর লইয়া আসিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেও, মহিম সে রাত্রে আর ওবাড়ী যাইতে পারিল না।

তটিনীর কথায় মহিম অনেকখানি সচেতন হইয়া উঠিল। ঘোলা জলে এক টুক্‌রা ফট্‌কিরি পড়িলে যেমন জল আপনা-আপনি স্বচ্ছ হইয়া আসে, মহিমের বুকের ভিতর তটিনীর ইঙ্গিতে কতকটা তেমনি কাজই হইল।

আইন পরীক্ষার তখন আর দুই মাস মাত্র বাকী। বাড়ীতে পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, মহিম অগ্রহায়ণের মাঝা-মাঝি কলিকাতা রওনা হইল। যাওয়ার সময় সরোজিনীর নিকট প্রকাশ্যে সকল কথা জানাইয়া, মেনকাকে সে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়া গেল।

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মায়ের কঠোর শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া রমলা যে-দিন রাজমহল ছাড়িয়া স্বামীর সংসার করিবার জন্য রঘুনাথগঞ্জে আসিল, সেদিন তাহার অন্তরের গোপন তলে একটা তীব্র হাহাকার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। আত্মসম্মানের চাপযন্ত্র যখন ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে, তখন তাহার ভারে হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইয়া গেলেও, সহ্য করিতে হয়; তাই রমলাকে সে বেদনা নীরবে বহন করিতে হইল। জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলার প্রথম প্রকোপেই তাহাকে এমন নির্য্যাতিত করিয়া তুলিল যে, রমলার ফুটন্ত প্রাণ-মন তাহাতে একেবারে অসাড় হইয়া গেল।

রঘুনাথগঞ্জে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন কিরূপভাবে কাটিল, তাহা রমলা নিজেও ভাবিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু দিনে দিনে আত্মবিদ্রোহের মাত্রা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, নিজের অসহায় অবস্থা দেখিয়া সে যেন ততই শিহরিয়া উঠিতেছিল। এইবার নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য একটা অবলম্বনের আশায় রমলা ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে হাত বাড়াইতে লাগিল। অন্তরের নগ্ন শূন্যতাকে চাপা দিতে না পারিলে, সে আর কোনোমতেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবে না। ঠিক সেই সময় রমলা বুকের কাছে পাইল লীলাকে। অতি নিবিড় ভাবে লীলাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, সে তাহার বর্ত্তমানকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিরণের ছোট বোন লীলা—নিতান্ত সঙ্গীহীনা, স্নেহবঞ্চিতা, সরলা—গ্রামের মেয়ে।

লীলাকে রমলার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তেরো বৎসরের কচি লীলা; বিকচোন্মুখ ফুলের মত সুন্দর। অন্তরের একান্ত কোমলতাটুকু যেন গাঢ় গোরোচনার আভার মত চোখে-মুখে মাখানো। রমলার স্নেহ-স্পর্শে তাহার বুকে যে পরিস্ফুট ছাপ পড়িয়াছিল, তাহাতে রমলা বেশ বুঝিল—লীলা স্নেহের কত কাঙাল। সংসারে আপনার বলিতে এক দাদা ভিন্ন আর কেহই নাই। মা-বাবা কবে চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা তাহার মনেও পড়ে না। লীলা শুধু জানে দাদাকে। দাদাকে সে কত ভালবাসে! উচ্ছৃঙ্খল দাদার কাছে পদে পদে লাঞ্ছিতা হইলেও, লীলা তাহার উপর রাগ করিতে পারে না। কিরণ যখন কলিকাতায় পড়িত, তখন সে থাকিত দূর-সম্পর্কীয়া এক পিসিমার কাছে। পিসিমার ভয়ে চোখের জল ফেলিতে না পারিলেও, দাদার অভাব সে পলে পলে কেমন করিয়া অনুভব করিত, তাহা লীলার অন্তর্যামীই বুঝিতেন।

লীলাকে পাইয়া রমলা অনেকখানি আনমনা হইয়াছিল। আর লীলাও বৌদির স্নেহ-স্পর্শে বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। সময় সময় মন যখন বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, রমলা তখন লীলাকে গড়িয়া তুলিবার দিকে অধিক মনোযোগ দিয়া সে দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। নিতান্ত অসহ্য হইলে, কিরণ ও লীলাকে লুকাইয়া রমলা নিভৃতে বসিয়া কাঁদিত। শত চেষ্টাতেও মহিমের স্মৃতি সে একদিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই।

সেদিন স্নানের পর রমলা পিঠের উপর কালো চুলের রাশি এলাইয়া রোয়াকে বসিয়া আপন মনে লীলার ব্লাউস্ সেলাই করিতেছিল। বহুদিনপর হঠাৎ অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল: চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহিম। আচম্বিতে বিদ্যুতের ঝলক লাগিয়া রমলার মুখ-চোখ যেন অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার গভীর অন্ধকারে ভরিয়া গেল! রমলা এত বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, মহিমকে অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। তাহার আপাদমস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।

—"রম-ল্"। রমলা আবার শিহরিয়া উঠিল! তাহার মুখে তখন কথা সরিতেছিল না। মহিমের সেই চির-অভ্যস্ত আদরের ডাক—স্মৃতির শাখা-প্রশাখাকে মুহূর্ত্তে আলোড়িত করিয়া, রমলার বুকের ভিতর ঝড় তুলিয়া দিল। মহিমকে রমলা আজ ছয় মাস দেখে নাই। এই ছয়মাসই যেন তাহার নিকট একটা যুগ বলিয়া মনে হইয়াছে। মহিমের অস্তিত্ব যে তাহার শিরা-উপশিরায় প্রতি মুহূর্ত্তে বাজিয়া উঠিত।

অনেকক্ষণ পর চোখ মেলিয়া রমলা একবার মহিমের মুখপানে চাহিল। এই কয়েক মাসে সে সুন্দর চেহারার কী ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

রমলার অবস্থা লক্ষ্য করিবার মত মনের অবকাশ মহিমের তখন ছিল না। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্মাদের মত মহিম যে কি বলিয়া চলিয়াছিল রমলা তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিল

না।............হঠাৎ শেষের কয়েকটী কথা কাণে যাইতেই সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"না—না, মহিমদা, মাপ কর।"

... ...

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। তার পর রমলা মহিমকে প্রণাম করিয়া বলিল—"না মহিমদা; তুমি ব'ল্‌ছো,—মান্‌লাম তা সবই সত্যি। কিন্তু আমি পার্‌বো না। জগতের চোখে তিনি যা-ই হন্, আমার কাছে স্বামীই।"

রমলার মনের ভাব বুঝিয়া মহিম অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। আবিষ্টের মত এবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল—"যা ভাল বোঝ, তাই কর। তবে আমার কথাগুলোও একবার ভেবে দেখো। শুধু আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বেঁচে থাক্‌বার দিন আর নাই। যেকালে ছিল, সেকালে মানুষের জীবনও হয় তো এর চেয়ে উন্নত ছিল অনেক বেশী। যাকে দেবতা ব'লে পূজো ক'রবে, মানুষ যদি তার আগা-গোড়া কেবল পশুত্বই দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে আর ভক্তি আসে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্ততঃ নিজেকে ভালো ক'র্‌বার চেষ্টা-যত্নটাও তার থাকা দরকার। নইলে—"

"থাক্, মহিমদা।" মহিমের কথায় বাধা দিয়া রমলা বলিল—"অনর্থক ওসব নিয়ে আর তর্ক ক'রে লাভ কি বল? জীবনের পথে যা এসে প'ড়বে, তার সবই যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে,—তার মানে কি আছে? কোনোটা হয়তো একবারে নিখুঁত হ'য়ে আসে, কোনোটাকে প্রাণপাত ক'রে নিজের মত গ'ড়ে নিতে হয়। চেষ্টা যদি নিষ্ফলই হয়, তখন সহ্য করা ভিন্ন তো আর উপায় নাই।"

কথাগুলি বেশ মোলায়েম হইলেও, মহিমকে বিঁধিতেছিল তীরের ফলার মত। এ কখনই রমলার নিজের কথা নয়। মহিম বুঝিল, কতখানি অভিমান চাপিয়া সে এমন স্বচ্ছ ভাষায় জবাব দিতেছে। রমলার এই প্রচ্ছন্ন অভিমান যে কাহার উপর, তাহাও মহিমের বুঝিতে বাকী রহিল না। তবুও সে দাবীর সঙ্গেই রমলার কথায় বাধা দিয়া বলিল—

"রমল্, এ তোমার মনের কথা নয়। এই নিছক্ নভেলী ভাবা, কোথা থেকে বের'চ্ছে—তা জানি। তাই, না ব'লে পার্‌ছি না যে, সব দিক ভাল ক'রে একবার ভেবে দেখো। দোষ শুধু আমারই নয়। নিতান্ত নিরুপায় না হ'লে কখনই এ হ'তে দিতাম না। আর কাকীমার জেদও এর জন্যে যথেষ্ট দায়ী। নইলে, কিরণের মত একটা অপদার্থের হাতে··· ।"

"থামো, তোমার ছুটি পায়ে ধরি। আমার ভাল-মন্দ যখন আমি নিজেও বুঝ্‌তে শিখেছি, তখন আর ওসব নিয়ে তোমাদের শান্তির জীবনে কোনো অশান্তি না টেনে আনাই ভাল। তুমি বাড়ী ফিরে যাও; আমি যাবো না। উপযাচক হ'য়ে সমবেদনার জন্যে তো এখনো হাত পাতি নি, তবে কেন মিছে আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ?"

রমলার কণ্ঠস্বরে পর্য্যাপ্ত শ্লেষ ফুটিয়া উঠিল।

কঠোর ইঙ্গিতটুকু হজম করিতে গিয়াই বোধহয় মহিমের কথাগুলি বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে জড়াইয়া গেল—"যে অভিমান কাকীমার জীবনে অত বড় বিপ্লব ঘটিয়েছে, তোমার জীবনও যে সেই অভিমানেই পুড়ে' ছাই হবে—তা'তে আর ভুল নাই। তবুও

বলি—যদি কখনো দরকার মনে হয়, অন্ততঃ একটু সংবাদ দিও। অকারণ অভিমান ক'রে জীবনে অশান্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুলো না।"

মনের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য রমলা জোর করিয়া মহিমের উপর নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার তীব্র খোঁচায় মহিম এক তিলও বিচলিত হইল না। আবার তেমনি স্বাভাবিক সস্নেহ স্বরেই বলিল—"তুমি যতই রূঢ় হ'য়ে আমায় ফিরিয়ে দাও রমলা, বিরূপ ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে না,—কোন মতেই না। তোমার আসন যতখানি ছিল, চিরদিন ততখানিই থাক্‌বে।"

এবার রমলার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিবার উপক্রম হইল। ইচ্ছা হইতেছিল মহিমদার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—'তোমায় চিনি, ওগো চিরদিন চিনি। তবুও এ ছাড়া আমার উপায় নাই। আজ তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে গিয়ে নিজেকে যে কী নির্ম্মম শাস্তি দিচ্ছি, তা অন্তর্যামীই জানেন।' কিন্তু পারিল না, আর হয় তো পারিবে না—সারা জীবনেও না।

মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া, রমলা কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—"খুব হ'য়েছে মহিমদা, আর অন্তরের দোহাই দিয়ে কাজ নাই; সে পরিচয় যথেষ্টই পেয়েছি। তোমাদের দয়া আমি সহ্য ক'রতে পার্‌ছি না। তুমি বাড়ী ফিরে যাও; আমি যাবো না, রাজমহল—আর এ প্রাণ থাক্‌তে নয়।"

উত্তরে মহিম একটা কথাও বলিতে পারিল না। রমলার এ তিরস্কার যেন তাহার বুকে চাবুকের মত আঘাত করিল। শত অভিমান সে আনন্দের সঙ্গে মাথা পাতিয়া লইয়াছে, কিন্তু এত বড় অবহেলার জন্য কোনোদিনও প্রস্তুত ছিল না।

এবার নিজেকে সংযত করিয়া লইতে অনেকখানি বেগ পাইতে হইল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মূকের মত মহিম ক্ষণেক অবসন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে জল আসিতেছিল। এই রমলার জন্যই সে একদিন পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিল; হয় তো আজো আছে। জীবনে যাহাকে প্রথম আলোর মত নিবিড়ভাবে চাহিয়াছে, তাহার কাছে এ প্রতিদান সে স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই।

দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্য মহিম তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লীলা রান্নাঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"বৌদি, মহিমদা কি চ'লে গেলেন? এই ভরা দুপুর-বেলায় না নেয়ে-খেয়েই··· ?"

সে কথা রমলার কাণে গেল কিনা সন্দেহ। আবিষ্টের মত জানালার গরাদে ধরিয়া সে তখন একদৃষ্টে পথ পানে চাহিয়া ছিল। কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মহিম দ্রুতপদে চলিয়াছে।

চাতাল হইতে নামিয়া লীলা দরজায় আসিবার পূর্ব্বেই মহিম রাস্তার মোড় ফিরিল।

অত নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেও, মহিম চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রমলার সব ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া চূরমার হইল। আর সে কোনো মতেই চোখের জল রোধ করিতে পারিল না। অভুক্ত—ক্লিষ্ট মহিমকে সে প্রায় জোর করিয়াই তাড়াইয়া দিয়াছে। কেন, কে জানে! একান্ত আপনার সেই মহিমদা; তবুও সে যে আজ কেন ওরূপ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার উত্তর

হয় তো রমলা নিজের কাছেই দিতে পারে না। অথচ ইহা ছাড়া আর পথও ছিল না।

রমলা মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। চোখের জলে তাহার বুকের পুঞ্জীভূত বেদনা মুছিবার নয়। কত কথা—কত ব্যথা—কত কান্না-হাসির স্মৃতি! শৈশব হইতে জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি ঘটনা যেন আজ সিনেমার ছবির মত তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছে। মহিম তাহার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের আনন্দ-সঙ্গী; প্রথম যৌবনে সন্থ-স্নাত মনের বেদীতে আরাধ্যতম দেবতারূপে সে ওই মহিমকেই দেখিয়াছিল—পিতার মৃত্যুশয্যা পাশে। ভাবিতে গিয়া রমলার মন আজ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু নিজেকে প্রবোধ দিবার সম্বলও তাহার নাই।—না থাক্ সে সম্বল; রমলা চাহে না।—তবুও মহিমদা তাহারই সেই মহিমদা। মহিমদার অপরিমেয় স্নেহ আজো রমলার জীবনে কানায়-কানায় ভরিয়া আছে। অথচ রমলা স্বহস্তে সেখানে বাড়বানল জ্বালাইয়াছে।

মহিমকে ফিরাইবার জন্য রমলা যে কী নির্ম্মম আঘাত করিতেছিল তাহা নিজেও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিল। কিন্তু এই অকারণ বিদ্রোহ ঘোষণা ব্যতীত তাহার আর কোনো পথ ছিল না। অথচ না ফিরাইলেও সে পারিত। যতদিন কিরণ কলিকাতা হইতে না আসে, যশোদাকে বাড়ীতে রাখিয়া রাজমহল গেলে কোনো ক্ষতিই হইত না। যশোদা যথেষ্ট বিশ্বাসী। এক সমস্যা—লীলা; তাহাকে সে স্বচ্ছন্দে সঙ্গে লইতে পারিত। কিন্তু রমলা তবু পারিল না। নিজের সম্মান বাঁচাইয়া একদিন ঘৃণার

সঙ্গে যে রাজমহল ছাড়িয়া আসিয়াছে, সেখানে আবার তৃণের মত মাথা নোয়াইয়া সে কোনোমতেই যাইতে পারিবে না।

আত্মসম্মানের হাজার কৈফিয়ৎ তুলিয়াও রমলা আজ যেন কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারে না। '—মহিমদা যে অত্যন্ত অভিমানী ; হয়তো সারাদিন উপবাসেই কাটাইবে, শুধু তাহারই জন্য—' রমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহিমকে উত্তপ্ত করিতে গিয়া সে আজ নিজের বুকে যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া বসিল, তাহারই আগুনে রমলার সারা অন্তর হু-হু করিতেছিল।

মহিম যখন জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। মাথার উপর বৈশাখের প্রচণ্ড সূর্য্য আগুন-বৃষ্টি করিতেছে। অল্প পথ-শ্রমেই মহিম এতো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন আর কর্ত্তব্য স্থির করিবার মত সুস্থতাও তাহার ছিল না। রমলার কথা সে যতবারই ভাবিবার চেষ্টা করিল, মথিত চিত্তের উপর ভাসিয়া উঠিল তাহার নির্ম্মম কঠোরতা। প্রত্যাখ্যানের আঘাত মহিম সহ্য করিতে পারিত; কিন্তু এ অপমান তাহার অন্তরে অসহ্য বেদনা জাগাইয়া তুলিতেছিল।

আবর্জ্জনাময় মুসাফিরখানায় ঢুকিয়া তেল-চিট্‌ধরা একখানি জীর্ণ বেঞ্চের উপর খদ্দরের চাদর বিছাইয়া মহিম অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। ব্যাণ্ডেল-বারহারবার আপ্ ট্রেণ আসিতে তখনো প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী।

ষ্টেশনের ঘণ্টা শুনিয়া মহিম যখন জাগিয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে খাল-বিল ও মাঠের উপর তরুণ অন্ধকারের ঘোলাটে কালো পর্দ্দা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মহিম কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই। রাজমহলের গাড়ী বহুপূর্ব্বে জঙ্গিপুর ছাড়িয়া গিয়াছে। মুসাফির-খানা হইতে বাহির হইয়া মহিম একবার সেই পাতলা অন্ধকারের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সেই কালো পর্দ্দার আড়ালেও কিসের সন্ধানে তাহার মন ব্যাকুল

হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বাহিরের মহিম তখন ভিতরের মানুষ হইতে এতো বিচ্ছিন্ন যে, অন্তরের স্পন্দন তাহার মধ্যে কোন সাড়া খুঁজিয়া পাইল না।

মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া মহিম দ্রুতপদে কাউণ্টারে গিয়া হাওড়ার একখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ডাউন ট্রেণ তখন ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছে। রাজমহল না ফিরিয়া মহিম সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বসিল।

সারা অন্তর আজ বহির্জগতের মতই নিকষকালো অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে। রমলার স্মৃতিটুকু এতোদিন তাহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল, শূন্য জীবনের হাহাকারকে এতোদিন সান্ত্বনা দিয়াছিল; কিন্তু আজ যেন প্রবল ঝড়ে তাহা চিরদিনের মত নিবিয়া গেল। একদিন যে অনাগতের আশায় মহিম কষ্টময় কারাজীবন আনন্দের সঙ্গে বহন করিয়াছিল, তাহারই আগত রূপ যে এমন নিঃসম্বল করিয়া তুলিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। রমলা তাহার হৃদয়ের প্রত্যেকটী কেন্দ্রে এতদিন যেন উজ্জ্বল গ্রহের মত প্রদীপ্ত ছিল।

মহিম যখন জেল হইতে বাহির হইয়া শুনিল—কিরণের সঙ্গে রমলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অকস্মাৎ বিস্ফোরণে তাহার সারা অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কিরণ তাহারই সহপাঠী বন্ধু; কিন্তু আজ তাহাকে পরিচিত বলিতেও ঘৃণা হয়। জানিয়া শুনিয়াও যে

অত বড় লম্পটের হাতে মেনকা কন্যা তুলিয়া দিতে পারেন, তাহা মহিম স্বপ্নেও ভাবে নাই। রমলার জীবন কি এতই দুঃসহ হইয়াছিল! কাকীমা স্বেচ্ছায় তাহাকে নরকের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন! মহিম ধারণা করিতে পারিল না; তাহার বোধশক্তি কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মাত্র ছয় মাস; কিন্তু কাকীমা সেটুকু সময়ও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মহিম ইচ্ছা করিয়া কথা খেলাপ করে নাই। কাকীমাকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্য জীবনে কোনদিনই ছিল না। ...তাহার জেল? কাকীমাও যদি এ কারাদণ্ড অগৌরবের মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ভালই করিয়াছেন। সেখানে মহিম অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান পাইয়াছিল, সেখানে ঘৃণার বোঝা মাথা পাতিয়া লইতে পারিত না।

কিন্তু রমলা! সেও কি তাহাকে ঘৃণা করিবে? না, একথা মহিম কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। রমলার অন্তরকে সে অন্তর দিয়া চিনিয়াছে। মহিমদাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। কতবার শপথ করিয়াছে—'এ জীবনে মহিমদাই তার আদর্শ...'

মহিম স্থির করিল—যেমন করিয়া হোক, রমলাকে ফিরাইবে। শুধু সামাজিক কয়েকটা মন্ত্রের বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া কাকীমা তাহার সুন্দর জীবন কিরণের পায়ের তলে ফেলিয়া দিয়াছেন। মহিম সে বাঁধন খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িবে। কতকগুলি কাল্পনিক শব্দ যদি জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে নরকের গর্ত্তে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তবে সে কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে না কেন? সৃষ্টির আদি হইতে শাশ্বত রূপ লইয়া সমাজ মানুষের মধ্যে বাঁচিয়া নাই; মানুষ

তাহাকে গড়িয়াছে—আপনার কল্যাণের জন্য। সেই হাতে-গড়া নিয়মের শক্তি যদি জীবনের সমস্ত কল্যাণকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তোলে, তবে মানুষ তাহা বাঁচাইয়া রাখিবে কেন? যাহা সে কল্যাণের জন্যই গড়িয়াছিল, প্রয়োজন হইলে, তাহা ভাঙিয়াও ফেলিবে—কল্যাণের জন্য।

মহিম যেন উন্মাদের মত বাহির হইয়া পড়িল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবস্থায় কিরণের সঙ্গে রমলার জীবনকে যে সম্বন্ধ-সূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সে আমরণ যুদ্ধ করিবে। কিরণের পত্নী হইয়া রমলাকে চিরদিন মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে সে দিবে না।

মহিমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: জগতের সকলে তাহাকে বাধা দিলেও, রমলা তাহার উদ্দেশ্যের পথে কখনই বিরোধী হইবে না। কিন্তু সে যখন আজ মহিমকে শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, অপমান করিয়া তাড়াইল, তখন নিমেষে মহিমের চোখের সম্মুখ হইতে সব আলো অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহিম কখনই আশা করে নাই যে রমলা এমন ভাবে ফিরাইবে। সে যেন সকল নাগালের বাহিরে নিজেকে টানিয়া লইয়াছে।

আজ মহিম কোনমতেই রমলাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না; অথচ তাহাকে অভিশাপ দিতেও মন পিছাইয়া পড়ে। যে ব্যথা বহিতে অন্তর অবিশ্রাম আর্ত্তনাদ করিয়া মরে, সে ব্যথা মুছিয়া ফেলিতেও প্রাণ শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠে। যন্ত্রণার ভিতরেও যেন একটা তন্ময়তা আছে; সে তন্ময়তা ব্যথায় পূর্ণ হইলেও, জীবনের নিঃসঙ্গতাকে চাপা দিয়া রাখে।

২৬

রমলার চিন্তা মহিমের সারা অন্তর তোলপাড় করিতেছিল। পরিচয়ের প্রথম দিন হইতে জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় অবসাদগ্রস্ত মনের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ট্রেণের জানালায় মুখ বাড়াইয়া মহিম নিস্পন্দ বসিয়া ভাবিতেছিল—তাহার আগামী জীবনের কল্পিত পাতাগুলি হইতে রমলাকে মুছিয়া ফেলিলে, কোন্ অবশেষটুকু লইয়া সে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

অন্ধকারের বুকে চলন্ত ট্রেণ হইতে দেখা যায়—অদূর পল্লীগৃহের কম্পমান প্রদীপ; মৃত্যুর গুহায় যেন প্রাণের এক একটী ক্ষীণ স্পন্দন। বাতাস করুণাহীন শুষ্কতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ইতিবৃত্ত

রমলার পিতা সতীনাথবাবু ছিলেন রেল-কর্ম্মচারী। পাবনার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে—খানা-ডোবা ও জঙ্গলের মাঝখানে ছিল পৈতৃক বাস। মা-বাপ আর ছোট ছোট কয়েকটী ভাইবোনকে ম্যালেরিয়ার হাতে নিঃশেষে তুলিয়া দিয়া, সেই যে চব্বিশ বৎসর বয়সে সতীনাথ পৈতৃক ভদ্রাসনের মায়া ত্যাগ করিয়া, শেষ নমস্কার জানাইয়া আসিলেন, তার পর কোন দিনের জন্যও আর রহিমপুরে পদার্পণ করেন নাই। রেল কোম্পানীর মামুলী দুখানি কুঠরি ও একটী রান্নাঘর-ওয়ালা সঙ্কীর্ণ বাসা বাড়ীতেই জীবনযাত্রা এক প্রকার চলিয়া যাইতেছিল।

চাকরিতে প্রবেশ করার বৎসরকাল পরেই সতীনাথ এক অনাথার কন্যাকে বিবাহ করেন। বন্ধু-বান্ধবের ঘটকতায় হইলেও, মেনকাকে তিনি নিজে পছন্দ করিয়াছিলেন। মেনকা গরীবের মেয়ে, কিন্তু সুন্দরী ও শিক্ষিতা। বিশেষতঃ তাহার তেজস্বিতা সতীনাথকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল।

... ...

সাধারণ রেল-কর্ম্মচারীর অদৃষ্টে যাহা ঘটে: সতীনাথবাবুর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিত লোক-সমাজের বাহিরে,—মাঠ, গ্রাম বা নগরের প্রান্তে ষ্টেশনের ছোট্ট একটী কোয়াটারে। কিন্তু সতীনাথ কোনদিনই নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন নাই। দাম্পত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়গুলি একা মেনকাই মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। তার পর সেই সুখের নীড়ে যখন একে একে নূতন

দুইটি অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইল, সতীনাথের ক্ষুদ্র সংসার পূর্ণতার আনন্দে মুখর হইয়া উঠিল।

উভয়ে বহু গবেষণা করিয়া সেই দুই নবাগতার নাম রাখিলেন—তটিনী আর রমলা। তটিনীর চেয়ে রমলা চার বৎসরের ছোট।

অনেকদিন লুপ লাইনের কতকগুলি ছোট ছোট ষ্টেশনে নির্জ্জন বাসের পর, সতীনাথ সেবার হঠাৎ বদ্‌লি হইলেন ধূলিয়ানে; বনবাস শেষ করিয়া বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে যাওয়ার মত। ধূলিয়ান ছোট ষ্টেশন হইলেও, ব্যবসার জন্য লোকসমাগম কম ছিল না। বিশেষ, লাহার কারবার যেন ধূলিয়ানকে কেন্দ্র করিয়াই বাড়িয়া উঠিতেছিল। রেল লাইনের দুই পাশে বড় বড় মাঠ ও ধানক্ষেতের উপর সযত্ন-রোপিত কুলগাছের সারি ধূলিয়ান হইতে তিলডাঙ্গা পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড কুলবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্যবসা উপলক্ষে যাঁহারা ষ্টেশনে অধিক যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই সতীনাথের বেশ ঘনিষ্ঠতা ও সম্প্রীতি হইয়া উঠিল।

রাজমহলের উকিল মণিশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন লাহার একজন বড় আড়তদার। ব্যবসার জন্য তিনি প্রায়ই ধূলিয়ানে আসিতেন। সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিলেও, মণিশঙ্কর ছিলেন অতি অমায়িক ও উদার। অর্থ তাঁহার অন্তর-রাজ্যে কোন পরিবর্ত্তন

ঘটাইতে পারে নাই। সতীনাথ ও মণিশঙ্করের মধ্যে অতি অল্পকালেই বন্ধুত্বের প্রগাঢ় বন্ধন গড়িয়া উঠিল।

ইদানীং কার্য্য উপলক্ষে ধূলিয়ানে আসিয়া মণিশঙ্কর প্রায়ই সতীনাথের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। উভয়ের পার্থিব অবস্থায় বিরাট পার্থক্য থাকিলেও, আন্তরিকতা এমন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ব্যবধানের রেখামাত্র ছিল না।

তটিনী তখন সবে মাত্র বারো বৎসরে পড়িয়াছে। মেনকা আপন-হাতে কন্যা দুইটিকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সতীনাথ স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তটিনী ও রমলা বাড়িয়া উঠিতেছিল—স্নেহপরায়ণ পিতামাতার অন্তরের সব চেষ্টা ও যত্ন লইয়া—তাঁহাদেরই শরীরী আদর্শের মত। সতীনাথ তটিনীকে অনেক-কিছু পড়াইয়াছিলেন। তাহার শিক্ষা বয়সের অনুপাত ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

তটিনীকে দেখা অবধি মণিশঙ্করের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া-ছিল—তাহাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিয়া সতীনাথ ও মেনকার সহিত বন্ধুত্বের যোগসূত্র আরো দৃঢ় করিয়া তুলিতে। কিন্তু সুযোগের অভাবে তিনি সে কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই।

সেদিন তটিনীর জন্মতিথি উপলক্ষে সতীনাথের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া, মণিশঙ্কর আর সে কথা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; প্রসঙ্গক্রমে অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

মেয়ের বয়স পানে চাহিয়া মেনকার প্রথম একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু মণিশঙ্করের এই আন্তরিক আগ্রহ স্বামী-স্ত্রীর কেহই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলেন না। সতীনাথও সবদিক্ বিবেচনা

করিয়া, ভগবানের দেওয়া এত বড় সুযোগ ছাড়িলেন না। মণিশঙ্কর মহৎ ও উদার; আর অবনী সর্ব্বাংশে তটিনীর উপযুক্ত পাত্র।

সেই অগ্রহায়ণেই তটিনীর বিবাহ হইয়া গেল, মণিশঙ্কর ও সতীনাথের অপরিসীম তৃপ্তির ভিতর দিয়া। গভীর বন্ধুত্বের প্রবাহ যেন দুইটি পরিচিত পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার গৌরব-প্রতিষ্ঠা সার্থক করিয়া তুলিল।

তার পর একে একে আরো পাঁচটী বৎসর কাটিয়া গেল. সংসারের অনেক-কিছু ওলট্-পালট্ করিয়া। তটিনীর তরুণ-জীবন—সবে মাত্র আনন্দ-মুখর-গতিতে পূর্ণতার দিকে ছুটিয়া চলিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের নির্ম্মম আঘাতে তাহা ধূলার বুকে লুটাইয়া পড়িল। যে ব্যবসা মণিশঙ্করকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই আবার আকস্মিক ভাটায় সুদে-আসলে সব আদায় করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব করিল।

সতীনাথ তখন মল্লারপুরে বদ্‌লি হইয়াছেন। মণিশঙ্কর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীরঞ্জনকে লইয়া কারবার দেখাশুনার জন্য ধূলিয়ানে আসিলেন;—চৈত্রের মাঝামাঝি। সতীনাথের বাসা না থাকায় নিজেদের লাহার-গুদামেই থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

তিন দিন পর।

রাত্রি তখন গভীর; দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর কুলি-মজুর সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সহসা ভয়ার্ত্ত কোলাহল শুনিয়া অবনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্তর কাঁপাইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল। অবনীর বুকের ভিতর ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল; দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। আগুনের কী ভয়াবহ ধ্বংসলীলা! কোনরূপে

মণিশঙ্করকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া অবনী যখন ছুটিয়া আসিল, তখন তালুকদারদের গুদামেও আগুন ধরিয়াছে। ······লাহার সংস্পর্শে লেলিহান জিহ্বা ক্ষিপ্রবেগে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল !

কয়েকটী রুগ্ন কুলির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া, অবনী ভীষণ বিপন্ন হইয়া পড়িল। উত্তপ্ত লাহা তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া গেল যে, অবনী প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর নিজেকে টানিয়া তুলিতে পারিল না।

······বৃদ্ধ মণিশঙ্কর পাগল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল —বুঝি মুহূর্ত্তে পৃথিবী অতলস্পর্শ অগ্নি-গহ্বরে নামিয়া যাইতেছে।

মহিম আসিয়া তাহার ক্ষিপ্তপ্রায় বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া গেল, দাদার চিতায় অশ্রুজলের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া। মণিশঙ্কর একবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। অবনীর অন্ত্যেষ্টি দেখিতে হইবে, তাহা তিনি কোনদিনের জন্য ভাবিতেও পারেন নাই। সিংহ শিশুর মত তেজস্বী ও বলবান্ পুত্র হারাণোর ব্যথা তাঁহার জীর্ণ বুকের ভিতর ভীষণ বিসুভিয়সের মত জ্বলিয়া উঠিল। মণিশঙ্করের সব আশা ও শক্তি যেন মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

আর তটিনী ! একটী শ্যামল সুন্দর পুষ্পবীথি পলকের ঝঞ্ঝায় বিরাট সাহারার মত শূন্য ও তপ্ত হইয়া উঠিল। জীবনের নব বর্ষায় যেখানে পূর্ণতার উচ্ছল স্রোত দুকূল ছাপাইয়া চলিয়াছিল, সেখানে পড়িয়া রহিল—শুধু নিদাঘের তাপ-শুষ্ক একটা শীর্ণা নদী : বেগহীন—গতিহীন—নীরব—নিষ্পন্দ।

পুত্রশোকাতুরা সরোজিনীর সব ক্ষোভ যেন ক্রমেই গড়াইয়া পড়িতে লাগিল বেচারী তটিনীর উপর। অভাগীর ভাগ্যদোষেই বুঝি তাঁহার কপাল ভাঙিয়াছে।

তটিনীর প্রতি সরোজিনীর আন্তরিক স্নেহ হয় তো কোনদিনই ছিল না। তবু তাহাতে তটিনীর মনে দাগ পড়ে নাই; মণিশঙ্করের স্নেহ ও অবনীর অফুরন্ত ভালবাসায় তাহার জীবন পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ তাহার রিক্ত হৃদয়ে সরোজিনীর অপ্রসন্ন দৃষ্টি আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

ধূলিয়ান হইতে যে-রোগের বিষ বহন করিয়া সতীনাথ মল্লারপুরে আসিয়াছিলেন, তাহার জের তখনও চলিতেছিল। তার উপর তটিনীর বৈধব্যের আকস্মিক দুঃসংবাদ তাঁহার মাথায় সহস্র বজ্রের মত আসিয়া পড়িল। আত্মীয়-স্বজনহারা জীবনটা কোনোরূপে একটু সুখের স্বাদ পাইয়াছিল মাত্র; কে জানিত যে তাহা পূর্ব্বজন্মের নিদারুণ অভিশাপে সহসা অঙ্কুরেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাঁহার বড় যত্নের—বড় আদরের তটিনী, সবে মাত্র হাসিমুখে সংসারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান, তাহার জন্য কি একবিন্দুও মঙ্গল-আশিস্ রাখ নাই প্রভু!

অভাগী তটিনীকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া মরিলেও, সতীনাথ রাজমহল আসিতে পারিলেন না। তিনি তখন শয্যাগত।

অবনীর শোকে হৃদয় নিঃশেষে ভাঙিয়া গিয়াছিল; কিন্তু মণিশঙ্করের বন্ধুপ্রীতি তখনো অন্তরের কোণে কোণে সজাগ হইয়া বাঁচিয়া ছিল। সতীনাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়া, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সতীনাথকে বার-বার অনুরোধ করিলেন—'কিছুদিন কর্ম্মস্থল হইতে অবসর লইয়া রাজমহলে আসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য।' কিন্তু সতীনাথ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তবে

রাজমহলে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। মেনকাই তাহাতে বিশেষ বাধা হইয়া দাঁড়াইল। সরোজিনীর ব্যবহারের যে আভাস সে ধূলিয়ানে থাকিতে কয়েকবার পাইয়াছিল, তাহাতে তটিনীর এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের উপর আবার সেখানে গিয়া বাসা বাঁধিতে তাহার সাহস হইল না।

মণিশঙ্কর পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না; তখন অগত্যা তিনি তটিনীকে কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে আরো তিন বৎসর কাটিয়া গেল।······ দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন—নিঃশব্দে পা ফেলিয়া সময় ছুটিয়া চলে, ভাঙা-গড়ার দাগ পিছনে ফেলিয়া। সেই পথের পাশে বসিয়া হাস্যময়ী নিয়তি আনমনে জাল বুনিয়া যায়; নিপুণহাতে কখনো গ্রন্থি বাঁধে, কখনো খুলিয়া দেয়। আজ যাহা কঠিন, কাল তাহা সহজ হইয়া আসে; চিরদিন যাহা স্বচ্ছ ও সরল সহসা তাহা জটিল দুরূহ হইয়া উঠে। মণিশঙ্করের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও যাহা দুঃসাধ্য ছিল, মহিমের পক্ষে তাহা আপনা-আপনি সহজ হইয়া আসিল।

······হাওয়া পরিবর্ত্তনের অছিলায় মণিশঙ্কর প্রকারান্তরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন; সংসারের ভার মহিমারঞ্জনের হাতে

তুলিয়া দিয়া। মহিমের বয়স তখন প্রায় চব্বিশ। এম. এ. পরীক্ষায় সে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছে ; শুধু বাকী ছিল আইনের শেষ পরীক্ষাটি। সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া মণিশঙ্কর যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কতক ব্যয় ও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেলেও, অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহাই একমাত্র পুত্রের পক্ষে যথেষ্ট।

সংসারের প্রতি যতক্ষণ শেষ আকর্ষণটুকুও ছিল, মণিশঙ্কর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—সতীনাথ ও মেনকাকে রাজমহলে আনিয়া তাঁহাদের স্থায়ী বাসের একটা ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা হয় নাই।······আজ আর মণিশঙ্করের সেই অপূর্ণ ইচ্ছা সফল করিবার জন্য মহিমকে চেষ্টা করিতেও হইল না। সতীনাথ স্বেচ্ছায় রমলা ও মেনকার ভার তাহার হাতেই তুলিয়া দিলেন।

ফাল্গুন, ১৩৩৪

শীতের শেষ। কনকনে বাতাসের জড়তাটা তখন প্রায় বে-দখল হয়-হয়। মহিম পড়ার ঘরে বসিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল আর কয়েকখানি জীর্ণ ছবি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। পিছনে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তটিনী উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল; হয় তো পল্লবহীন গাছপালার গায়ে প্রকৃতির যে বৈধব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই কথা।

হরকরার ডাক শুনিয়া মহিম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। তটিনী লক্ষ্য করে নাই।

কয়েক মিনিট পরেই মহিম ফিরিল—একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া।

তটিনী এবার তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কি, ঠাকুর-পো?"

"তার।" বলিয়া মহিম পুনরায় মনোযোগের সহিত টেলিগ্রামটা দেখিতে লাগিল।

তটিনী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কার তার? কে ক'রেছে?—কিসের—ঠাকুর-পো?"

"রমলা তার ক'রেছে। আজই আমাদের সেখানে যেতে হবে। কাপড়-চোপড়, অল্পের মধ্যে যা' দরকার, তা' এখুনি গুছিয়ে নাও বৌদি। বারোটা চুয়ান্নোর গাড়ীতেই যাবো।"

অজ্ঞাত আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া, তটিনী বোকার মত শূন্য

দৃষ্টিতে মহিমের মুখপানে চাহিল; করুণ ও উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবার অসুখ বুঝি খুব বেশী ?"

"হাঁ" বলিয়া মহিম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তটিনী ঠিক তেমনি অবস্থাতেই সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে ভাঙন ধরিয়াছে, এইবার বুঝি তার পূর্ণাহুতি। পৃথিবীতে স্নেহের যে আশ্রয়গুলি লইয়া সে আসিয়াছিল, তার প্রত্যেকটাই হয় তো এইরূপে একে একে মুছিয়া যাইবে, কিন্তু তটিনীর চলা থামিবে না। চোখের জল আর দুঃখের বোঝা লইয়া সে চলিবে সম্মুখের সুদীর্ঘ পথ—শুধু অসংখ্য অর্থহীন দিনের পুনরাবৃত্তি করিয়া।

স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় সতীনাথ প্রায় তিন বৎসরকাল নানা স্থানে ঘুরিয়াও যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, এবং কোম্পানীও যখন আর ছুটি মঞ্জুর করিতে নারাজ হইল, তখন সেই ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি পুনরায় যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন। তবে সতীনাথের মুখচাহিয়া, তাহাকে অপেক্ষাকৃত লঘু কার্য্য দিয়া রেল-কোম্পানী সাঁইথিয়া ষ্টেশনে সতীনাথকে নিয়োগ করিল। পুনরায় সেই একঘেয়ে জীবনের আসরে নামিয়া, সতীনাথ সাঁইথিয়ায় বাসা বাঁধিলেন।

সাঁইথিয়া সহরও নয়, পল্লীগ্রামও নয়; ই. আই. রেলের একটা স্বাস্থ্যকর বড় ষ্টেশন ও কারবারি জায়গা। সতীনাথের জীবনের সঙ্গে সাঁইথিয়ার যেন অনেকখানি মিলে; তাই সাঁইথিয়া তাঁহার ভালই লাগিল। একদিকে কোম্পানী লোহা-লক্কর আর তারের বেড়া জাল দিয়া সাঁইথিয়াকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টায়; আর একদিকে ব্যবসায়ীর দল তাহার হৃৎপিণ্ডের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছে—বড় বড় তেল-কল আর ধান-কল বসাইয়া। শোকে দুঃখে জীর্ণ বুকখানির পাঁজ্‌রাগুলিকে ঘিরিয়া, বালুকাময় মরুভূমির ফাঁকে ফাঁকে বহিয়া চলিয়াছে শীর্ণা ময়ূরাক্ষী,—যেন অতীত সুখের অতি-ক্ষীণ একটা স্মৃতিরেখা। তেল-কল আর ধান-কলগুলি যখন আকাশ-ছোঁয়া চিম্‌নির মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়ে, মনে হয় সাঁইথিয়ার জীর্ণ বক্ষ হইতে বুঝি উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে—বেদনার আগুন-ভরা।

সাঁইথিয়ায় আসিয়া, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতীনাথের প্রথম

প্রথম মনে একটু আশা হইয়াছিল; কিন্তু সেই সব নানা উপসর্গের উপর হঠাৎ যেদিন বেরি-বেরি আসিয়া দেখা দিল, সেই দিন হইতে সতীনাথ সকল আশা-ভরসাই ছাড়িয়া দিলেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতে নানা অশান্তি ও বাধা দুই হাতে ঠেলিয়া সতীনাথ অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে আসিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানি এক বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। নিজেকে টানিয়া তুলিবার মত শক্তি তাঁহার আর একবিন্দুও রহিল না। সতীনাথ বুঝিলেন—শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। শরীর ও মন দুই-ই আবার শিথিল হইয়া পড়িল। সতীনাথ শয্যা গ্রহণ করিলেন।

নিজের জমাখরচের পাতায় সতীনাথ যে হিসাবের অঙ্ক ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বিহ্বল হইয়া পড়িবার মত কিছুই ছিল না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল রমলা। রমলা তখন পনেরো অতিক্রম করিয়া ষোলয় পদার্পণ করিয়াছে। রমলাকে পাত্রস্থ করিয়া যাইতে পারিলেই সতীনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। মেনকার অসহায় জীবনের উপর এ ভার চাপাইয়া যাইতে তাঁহার অন্তর কোনোরূপেই সোয়াস্তি পাইতেছিল না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে অল্প যে কয়েকটী টাকা আছে, তাহাতে বিধবা পত্নীর শেষ জীবনে এক বেলার এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার কোনো উপায়ই হইবে না।

সতীনাথের জীবন-দীপ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া মেনকা ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহার সাহস ও

দৃঢ়তা সবই যেন উপিয়া যাইতেছিল। ‘অসহায় নারী সে; কাহার আশ্রয় লইবে! কে তাহার এই বিপন্ন জীবনে আশ্রয় দিবে? রোগ-শয্যায় শায়িত স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে ভরসা দিবার মত কেহই নাই।’ অবনীর কথা মনে পড়িয়া মেনকার চোখে অবিশ্রাম জল গড়াইতে লাগিল। মণিশঙ্করের নামে মেনকা মনে মনে একটু ভরসা পাইতেছিল বটে, কিন্তু তিনিও তো আজ সম্পূর্ণ উদাসীন: সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি যেদিন সস্নেহে কাছে ডাকিয়াছিলেন, মেনকা সেদিন আত্মাভিমান লইয়া পিছাইয়া আসিয়াছিল। আজ কি ডাকিয়া আর তাঁহার সাড়া পাইবে?

রমলার টেলিগ্রাম পাইয়া তটিনী ও মহিম আসিয়া উপস্থিত হইল। মহিমকে দেখিয়া মেনকা অনেকখানি সাহসে বুক বাঁধিলেন। মহিমকেও তাঁহারা সন্তান বলিয়াই জানেন। সতীনাথ ও মেনকার সবটুকু পুত্র-স্নেহ অবনী আর মহিমকে ঘিরিয়াই ঝরিয়াছিল।

মহিম ও তটিনী যখন সতীনাথের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন রমলা পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতেছিল। এবার রমলাকে মহিম প্রায় দুই বৎসর পরে দেখিল। রমলা অনেকখানি লম্বা হইয়াছে; মুখ-চোখের সেই চঞ্চলতা যেন এখন অনেকটা সমাধিস্থ হইয়া আসিয়াছে। কিশোরী রমলাকে তখন সে দেখিয়াছিল—ফাল্গুনের রঙীন কচি পাতার

মত ; আর আজ দেখিল বৈশাখের গাঢ় সবুজ রঙ—অনেকখানি পূর্ণতার মাঝখানে।

রমলার শান্তোজ্জ্বল মুখখানির উপর বেদনার ম্লান ছায়া পড়িয়াছিল।

তাহারা ঘরে আসিতেই রমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল। তিন জনেই পরস্পরের মুখ পানে একবার চাহিল মাত্র, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। সতীনাথ নিমীলিত নেত্রে শয্যায় পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার সেই ঋজু বলবান্ দেহ আর তখন ছিল না; জীর্ণ হইয়া প্রায় শয্যার সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পিতার অবস্থা দেখিয়া তটিনীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল।

তটিনী ও মহিম শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিতেই সতীনাথ একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। সহসা তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবল উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল। শীর্ণ বাহু দুইটি বাড়াইয়া সতীনাথ মহিম ও তটিনীকে স্পর্শ করিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

সেদিন একাদশী। সকাল হইতে সতীনাথের দুর্ব্বলতা ও হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মত মহিম খুব সতর্কতার সহিত রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিল। মেনকার মন যেন সহসা অসাড় ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সতীনাথ হয় তো নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিতেছিলেন, তাই তিনিও আজ মেনকাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছেন না।

বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত পৃথিবীর মুখের উপর হইতে আলোর ঘোমটাখানি ধীরে ধীরে খুলিয়া পড়িতেছিল। নদীর হাল্‌কা স্রোতে ফাল্গুনের অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু যেন কষ্টির বুকে পাকা সোনার কয়েকটী উজ্জ্বল রেখার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্তিমিত দিবসের শেষ নমস্কার করুণ চাহনির মত ঘরের প্রত্যেকটী আস্‌বাবের গায়ে হাত বুলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে রমলা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সতীনাথ মাথা তুলিয়া নমস্কার করিলেন।······কিয়ৎক্ষণ পর সতীনাথ মহিমকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা মহিম, আমায় একবার বসিয়ে দাও না! শুয়ে' থেকে থেকে ঘাড়টা বড় ব্যথা হ'য়ে গেছে।"

আপত্তি জানাইয়া মহিম বলিল—"না কাকাবাবু, হার্ট একটু উইক্ হ'য়ে আছে, এখন ওঠা-বসা ক'র্‌তে ডাক্তার নিষেধ ক'রে গেছেন। দুই একদিনের মধ্যেই একটু সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন, তখন বসিয়ে দেব'খন।"

সতীনাথ ঈষৎ হাসিলেন।—সে হাসি যেমন ফিকে তেমনি নিষ্প্রভ।

"আচ্ছা তাই দিও বাবা! তুমি আর একটু সরে' এসে আমার সাম্‌নে একবার ব'সো মহিম। কতকগুলো কথা তোমায় ব'লবার আছে; না ব'লে যেন কোনো মতেই শান্তি পাচ্ছি না। বুকের ভিতরটা এক একবার তোলপাড় ক'রে উঠ্‌ছে—।"

মহিম আরো একটু সরিয়া আসিয়া সতীনাথের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"আজকের মত কথাগুলো না ব'ল্‌লে কি চলে না কাকাবাবু? আজ দুর্ব্বলতাটা একটু বেশী হ'য়েছে কি না!"

সতীনাথ আবার একটু হাসিলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মহিমের কোলের উপর হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—"তা হ'লে আর বলা হবে না বাবা; বুকের কথাগুলো বুকের মধ্যেই থেকে যাবে। সময় যে আর বেশী নাই, তা বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

সতীনাথের কথায় বাধা দিয়া মহিম অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিল—"ছি, কাকাবাবু; ও-সব কথা মোটেই মনে আন্‌বেন না। আপনার মনের জোর না থাক্‌লে কি চলে? আপনি যদি মন অত দুর্ব্বল ক'রে ফেলেন, তা হ'লে আমরা সাহস পাবো কেমন ক'রে?"

"পাগল ছেলে, জোর কি আর আছে মনে? অবনীর সঙ্গে সঙ্গেই সব হারিয়ে ফেলেছি বাবা। এখনও যেটুকুর বলে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছি, সেটুকু শুধু তোমাদের মুখ চেয়ে। কিন্তু তাও আর চলে না মহিম। খেয়া ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি; সবই বুঝতে পার্‌ছি। এ পারে ফেলে যাচ্ছি—তিনটি শোকাতুরা অনাথাকে। তাই, পিছন্ ফিরে তাদের দিকে চাইতে গিয়ে প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌ছে। আমার আর কেউ নাই।"

সতীনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন।

মহিমের চোখেও তখন জল আসিয়াছিল। অতি কষ্টে

সতীনাথকে সান্ত্বনা দিয়া মহিম বলিল—"তাঁদের জন্যে ভাব্‌বেন না কাকা! সে ভার আমার উপর রইল। আপনি ও-সব কোনো চিন্তা না ক'রে, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। বেশী কথা বল্‌বেন না।"

সতীনাথ নীরবে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। মহিম ধীরে ধীরে তাঁহার বুকে মালিশের ঔষধ মাখাইতে লাগিল। নিতান্ত হতাশ মনে রমলা পিতার পদতলে বসিয়া তখন চোখের জলে ভাসিতেছিল। দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন আজ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল।

পুনরায় চোখ মেলিয়া সতীনাথ মহিমের মুখপানে চাহিয়া উদাস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ এগারো-ই ফাল্গুন, না—মহিম ?"

"হাঁ, কাকাবাবু।"

"আজ রমলার জন্মদিন!" একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সতীনাথের বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল।

ক্ষণেক কি ভাবিয়া, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মহিমের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সতীনাথ বলিলেন—"বাবা মহিম, আজ মনটার ভিতর ঝড় উঠেছে; নিজেকে কোনোমতেই আজ আর চেপে রাখ্‌তে পারছি না। আমাকে বাধা দিও না বাবা, তা হ'লে শান্তি পাব না। ম'র্‌বার সময় পিছুটানে মনটা আমার ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বে। আমি যে অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছি মহিম!"

ব্যথিত মহিম চোখের জল মুছিয়া কম্পিত স্বরে বলিল—"তা হ'লে বলুন, কাকাবাবু। কিন্তু, যা ব'লবার—সংক্ষেপে বল্‌বেন। ডাক্তারের নিষেধ—"

"ব'ল্‌বার আর বেশী কিছু নাই। মনে যে কথা গাঁথা ছিল, অবনী চলে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা হারিয়ে ফেলেছি। তোমার বাবা!—ওঃ, কি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব তাঁর; ভগবানের দয়ায় তাঁর মত বন্ধু পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরও শেষের একটী অনুরোধ রাখ্‌তে পারি নি! আমার অসুখ শুনে' তিনি ব্যস্ত হ'য়ে আমায় রাজমহল নিয়ে যাবার জন্যে কত চেষ্টাই ক'রেছিলেন! তখন আত্মসম্মান প্রবল হ'য়েছিল; বুঝ্‌তে পারি নি। তাই আজ আর ব'ল্‌বার কোনো মুখ নাই আমার। নইলে শেষের বোঝা তাঁর ঘাড়েই চাপাতে পারতাম্। রমলার চিন্তায় যে আমি এক বিন্দুও শান্তি পাচ্ছি না বাবা! তিনি এখন সংসারত্যাগী; তুমি তাঁর যোগ্য ছেলে,—শিক্ষিত—তাঁরই মত উদার। বল বাবা মহিম, আমার শেষের একটা অনুরোধ রাখ্‌বে কি? তোমার বাবাও হয় তো ফেল্‌তে পার্‌তেন না। তোমার—"

সতীনাথের কথায় বাধা দিয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"কাকা-বাবু, আমি আপনার ছেলে। যা ব'ল্‌বার—নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

সতীনাথের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—"মা রমলা, একবার এইখানে এসো মা; আমার বুকের কাছটিতে"

রমলা ধীরে ধীরে পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটি তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে। শীর্ণ হস্তে রমলার হাতখানি ধরিয়া সতীনাথ নিজের বুকের উপর রাখিলেন। চোখের জলে তাঁহার গাল দুইটি ভাসিয়া যাইতেছিল।

তার পর মহিমের হাতের উপর রমলার হাতখানি দিয়া

সতীনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা, এই আমার শেষ অনুরোধ। আর কোনো ভার কখনও তোমাদের উপর চাপাতে আস্‌বো না। আমার পারের ডাক আমি নিজের কাণেই শুন্‌তে পাচ্ছি মহিম। বল, বল বাবা,—আমার শেষ ভারটি তুমি হাতে তুলে' নিলে! আমার চিরদিনের সাধ—"

মহিম লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল; কোনো উত্তর তাহার মুখে যোগাইল না।

মহিমকে নীরব দেখিয়া সতীনাথ পুনরায় বলিলেন—"লজ্জা ক'রো না, মহিম, সরল মনে বল'। বল' বাবা, আমার রমলাকে তুমি গ্রহণ ক'রলে। তোমার কথা পেলে আমার বুকখানা আজ হাল্‌কা হবে; আমি পরম শান্তির সঙ্গে আমার শেষ নিঃশ্বাসটা আজ ফেলে যাবো।"

লজ্জা-নম্র স্বরে মহিম বলিল—"আপনার ইচ্ছাই মাথা পেতে নিলাম কাকাবাবু!"

"আঃ—" সতীনাথের মুখে আর কথা বাহির হইল না; তাঁহার চোখ দিয়া অবিরাম জল গড়াইতে লাগিল। অশেষ শান্তির সঙ্গে হাতদু'খানি কপালে ঠেকাইয়া সতীনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রমলা ও মহিম একবার পরস্পরের মুখ পানে চাহিল। দুজনের মনই বোধহয় তখন আসন্ন বিপদের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মুখের উপর আগতপ্রায় ঝড়ের ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবুও সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়া উভয়ের বুক একবার যেন দুলিয়া উঠিল—অতি অতর্কিত একটা আনন্দের স্পন্দনে,—

তরুণ অন্তরের তলে। মহিম যেমন সেইদিন হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে রমলাকে পত্নী বলিয়াই মনে মনে বরণ করিয়া লইয়াছিল, রমলাও তেমনি সমস্ত হৃদয় দিয়া মহিমকে স্বামীর মতই পূজা করিয়া চলিয়াছিল। অথচ একথা উভয়েই বুঝিত যে, সেই বাঁধনই তাহাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাহার বলে তাহারা আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তখনো আয়ত্তের বাহিরে। রমলা ও মহিম উভয়ে যে কথা কোনোদিন পরস্পরের নিকট লজ্জায় প্রস্তাব করিতে পারে নাই, তাহা লইয়া গুরুজনদের নিকট কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সম্ভব হইল না।

রমলার বিবাহের জন্য মেনকা ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই, স্বামী জীবিত-কালে কোনোদিনই কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন নাই; উপরন্তু সতীনাথকেও অনেক সময় বিরত করিয়াছেন। তটিনীর বিবাহে যে ফলটা হাতে হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই যেন তাঁহারা আরো দমিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। রমলা দেখিতে দেখিতে সতেরো বৎসরে পড়িয়াছে। লোকের কথা মেনকা পূর্ব্বে কখনো গ্রাহ্যও করিতেন না; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে সে জোর কমিয়া গিয়াছে; মন আপনা-আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সতীনাথের মৃত্যুর পর একমাত্র মহিম ব্যতীত আর কোনো অভিভাবক ছিল না। কাজে কাজেই মহিমের কাছে মেনকা রমলার বিবাহের কথা প্রস্তাব করিলেন। বহুদিন হইতে অন্তরে যে গোপন-আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, প্রকাশ্যে আজ আর সে কথা উত্থাপন করিবার সাহস তাঁহার হইল না। অবনীকে হারাইয়া যে দাবীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছিল, মণিশঙ্করের সংসার ত্যাগ ও সতীনাথের মৃত্যুতে তাহা এমন-ভাবেই মুছিয়া গেল যে, সেদিকে হাত বাড়াইতেও মেনকা ভয় পাইতেছিলেন।

মহিম এতদিন আশা করিয়াছিল—রমলার বিবাহের জন্য মেনকা তাহার কথাই বলিবেন। কিন্তু আজ মেনকা যখন সে প্রসঙ্গে মহিমের কথা উল্লেখমাত্র না করিয়া শুধু অনুরোধ করিলেন

—"বাবা মহিম, রমল্‌কে আর আইবুড়ো রাখ্‌তে পার্‌বো না তোমার চেনা-জানা একটী ভাল ছেলে দেখে দাও। মনের সাধ তো জগতে কিছুই মিট্‌লো না ; আর—"

মহিম ক্ষুণ্ণ হইল ; কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। অতি সংক্ষেপে মেনকার কথা সমর্থন করিয়া কেবল বলিল—"দেখি।"

মেনকার প্রস্তাবে মহিম তৃপ্ত না হইলেও, ঠিক অসন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তিনি যে আরো কিছু বলিতেন, এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে অনেক কথা গোপন করিয়া গেলেন তাহা মহিম স্পষ্টই বুঝিল। মেনকার কথা ভাবিয়া দেখিলে সত্যই অন্তরে ব্যথা লাগে। মহিম তবুও নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিল না ; কিন্তু অশান্ত হইয়া উঠিল। সেদিন সারা রাত্রি ভাবিয়াও মহিম সমাধানের কোনো সহজ পথ দেখিতে পাইল না। একমাত্র উপায় তটিনীর সাহায্য।

মহিম নিঃসঙ্কোচে সকল কথা তটিনীকে জানাইল ; তটিনীও সানন্দে সে ভার হাতে তুলিয়া লইল। মহিম রমলাকে বিবাহ করিতে চায় ; তাহার স্নেহের পুতুল রমলা তাহার ঘরেই বধূ হইয়া আসিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দ-সংবাদ আর তটিনীর পক্ষে কি হইতে পারে! তটিনী তখনই সেই খবরটা মেনকাকে না জানাইয়া পারিল না। মহিমের মনোভাব জানিয়া মেনকার বুভুক্ষু হৃদয় অপরিমেয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অন্তরের একান্ত বাসনাটুকু যে ভগবান এমনভাবে সফল করিয়া তুলিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না। মেনকার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল ; পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে তিনি বার-বার প্রণাম করিলেন।

নকা ও তটিনী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেও, এ সম্বন্ধে
জনীর মতামতের জন্য বেশ একটু আশঙ্কা ছিল। এমন
কথাটা সরোজিনীর নিকট প্রস্তাব করিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত
ারো ছিল না। সরোজিনীর স্বভাব ও নিত্য-ব্যবহারের মধ্যে
নকা পূর্ব্ব হইতে যে ঝাঁজ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে
স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, সরোজিনীকে রাজী করা সহজ হইবে না।
বিশেষতঃ অবনীর মৃত্যুর পর মেনকা সরোজিনীর কাছে আর
কোনো সহানুভূতির আশা করিতে পারিতেন না। সেইজন্যই
তিনি রমলার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে
পারিলেন না। অগত্যা—তটিনীকেই সে ভার লইতে হইল।

* * * *

দুপুরে খাওয়ার পর সরোজিনী রোজই একটু 'গা গড়াইতেন';
তটিনী শাশুড়ীর পদসেবা করিত। তটিনীর সেবায় তাঁহার আগ্রহ
হয় তো কোনোদিনই ছিল না; অথচ সরোজিনী তাহাকে
নিষেধও করিতেন না। মনে মনে অনেকখানি জ্বালা থাকিলেও,
নিজের অজ্ঞাতসারে সরোজিনী পুত্রবধূর ভক্তি ও সেবার হাতে
আপনাকে এমনভাবে দিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা হইলেও
কোন সময় আর তাহা হইতে নিজেকে টানিয়া লইতে পারিতেন
না। অথচ তটিনীর উপর আক্রোশ ও রুক্ষতার ব্যাবহারিক
জের পূর্ব্বের মতই বজায় ছিল।

সেদিন দুপুরে সরোজিনী নীচের ঘরেই শুইয়া পড়িয়াছিলেন;
তটিনী কাজকর্ম্ম সারিয়া নিয়মমত তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া
বসিল, সরোজিনীও অভ্যাস মত নির্ব্বিকার পড়িয়া রহিলেন।

শাশুড়ীর পদসেবা করিতে করিতে একটু ইতস্ততঃ তটিনী সসঙ্কোচে ডাকিল—"মা!"

ডাকটা সরোজিনীর কাণে বেশ স্পষ্টই পৌঁছিল, কোনো উত্তর দিলেন না; পূর্ব্ববৎ চোখবন্ধ করিয়া নী পড়িয়া রহিলেন।

তটিনী বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, আবার মৃদুস্বে বলিল—"মা, আপনি কি ঘুম'লেন ?"

"না, ঘুমোই নি; কি ব'ল্‌বে—বল' না! বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি।" সরোজিনী পাশ ফিরিলেন।

ভাব দেখিয়া তটিনী বুঝিল যে শাশুড়ীর নিকট এখন এ প্রস্তাবে বিশেষ সুফল হইবে না; তবুও মহিমের নির্দ্দেশমত ঈষৎ 'হের-ফের' করিয়া একটু আব্দারের সঙ্গে বলিল—"মা, ঠাকুর-পোর বিয়ে-থা' কবে দেবেন ? আপনি যে খেয়াল ক'র্‌ছেন না মোটেই। বয়েস তো—"

হঠাৎ শাশুড়ীর মুখে দৃষ্টি পড়িতেই তটিনী থামিয়া গেল। সরোজিনীর মুখে তখন যে বক্র হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তটিনীর বুকের তলা পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল—ভীতি ও আশঙ্কায়।

যথেষ্ট শ্লেষের সঙ্গে একটু নাকি-সুরে সরোজিনী বলিলেন—"আহা, দরদী বৌঠান্! দেখ না মা, তোমার বোন্‌টার সঙ্গে দিয়ে যদি এটাকেও যমের বাড়ী পাঠাতে পারো।"

তটিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। শাশুড়ীর দৈনন্দিন বাক্য-বিষ অনেকটা গা-সহা হইয়াছিল বটে,

ও আজকার 'আঘাতে তটিনীর সারা বুক যন্ত্রণায় বিকল
য়া পড়িল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে আজ নিজেকে সংযত
রিতে পারিতেছিল না। 'উঃ ভগবান্, জগতে যাকে অনাথা
কর, তার কাছে কি মাতৃ-হৃদয়কেও মরুভূমি ক'রে তোল' ঠাকুর ?'
তটিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। পাছে শাশুড়ীর নজরে
পড়িলে আবার অকল্যাণের আশঙ্কায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন,
সেই ভয়ে মুখ নীচু করিয়া তটিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।
তাহার অবসন্ন দেহের প্রত্যেকটী পদ-ক্ষেপে বাঁচিয়া থাকিবার সব
আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন নিষ্পিষ্ট হইয়া মাটিতে মিলাইয়া যাইতেছিল।

মায়ের উক্তি মহিম স্বকর্ণে-ই শুনিল। তিনি যে ভিতরে
ভিতরে এতখানি নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা সে কোনদিন
ভাবিতেও পারে নাই। ইহাতে মহিম অন্তরে অন্তরে যতখানি
জ্বলিয়া উঠিল, রমলাকে হারাইবার আশঙ্কায় সে বিহ্বলও
হইয়া পড়িল ততখানি। সরোজিনীর কথায় যে কঠোরতা সে
লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে অনুরোধ উপরোধে যে কোনো কাজ
হইবে না, তাহা মহিম বেশ বুঝিল। কিন্তু, উপায় নাই। মায়ের
ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন কাজই করিতে পারিবে না। জীবনের
এই শুভ অনুষ্ঠান—, যাহার ফলাফলের বোঝা তাহাকে আমরণ
বহন করিতে হইবে, তাহাতে মাতৃ-অভিশাপ মাথায় করিয়া লইবার
সাহস তাহার হইল না।

মহিম উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। এই সহজ ও সাধারণ বিষয়
যে এতখানি জটিল হইয়া উঠিবে, তাহা সে একদিনের জন্যও
ভাবিতে পারে নাই। মেনকার বুকে সে-ই নূতন করিয়া আশা

জাগাইয়াছে। নিজের অবস্থা বুঝিয়া তিনি অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নীরবে বুকের তলায় চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। মহিমের দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া তাঁহার মন আশার আনন্দে ভরি উঠিয়াছিল। সতীনাথের যে দানের বোঝা মহিম মাথা পাতি লইয়াছিল, অক্ষম হইলেও, হয় তো সে তাহা বহিয়া চলিবার প্রাণপণ চেষ্টা জীবন ভরিয়া করিত। কিন্তু আজ জীবিতা মেনকা ও রমলার যে আশা-নিরাশার সমস্যা সে আপন হাতে সৃষ্টি করিয়া লইল, প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিয়াও তো তাহা জীবন পথ হইতে সরাইতে পারিবে না। অনেক ভাবিয়াও মহিম পথের নির্দ্দেশ পাইল না। অচঞ্চল মহিম এবার সত্যই অস্থির হইয়া উঠিল।

মহিম যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, সেখান হইতে নির্ব্বিবাদে পিছাইয়া আসা আর তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সে মণিশঙ্করের নিকট সকল কথা জানাইয়া পত্র লিখিল। তাঁহার শান্তিময় বৈরাগ্য-জীবনকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, মহিম তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত সমাধানের আর পথ খুঁজিয়া পাইল না। পত্রোত্তরে মণিশঙ্কর প্রকাশ্যে কোনো আদেশ দিলেন না; প্রকারান্তরে তাঁহার মতামতের কথা যাহা জানাইলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মহিম কর্ত্তব্য স্থির করিল। অন্ততঃ নিজের কাছে জবাবদিহি করিবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

আইন পরীক্ষার জন্য কলিকাতা রওনা হইবার পূর্ব্বদিন মহিম

'স্ত সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া মায়ের কাছে নিজেই সব কথা লেল। আদ্যোপান্ত শুনিয়া যে নিশ্চয়ই মা অনুমতি দিবেন,] বিশ্বাস তাহার ছিল না তাহা নহে। তবুও মনে মনে বেশ একটু ভয় ছিল, পাছে সরোজিনী জেদ ধরিয়া বাঁকিয়া বসেন।

মহিমের কথাগুলি সরোজিনী আগাগোড়া মনোযোগের সঙ্গেই শুনিয়া গেলেন; কোথাও কোনরূপ আগ্রহ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। শেষে মহিম যখন নিজেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল —"মা! এ ক্ষেত্রে কি তোমার কোনো অমত আছে? অন্ততঃ ওঁদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে চেয়েও কি আমাদের একটু সহানুভূতি করা উচিত নয়?"

সরোজিনী বেশ ধীর ও শান্তভাবে উত্তর দিলেন—"বেশ বাবা, তুমি এখন বড় হ'য়েছ; যা' ভাল বুঝ্‌বে, তাই ক'রো। তাতে আমার মতামতের অপেক্ষা ক'র্‌বার কোনো দরকার নাই।"

মায়ের কোন্ সুরে যে কি রাগিণী বাজে, তাহা মহিমের অবিদিত ছিল না। তবুও সে বিষয়ে আর কোনোরূপ প্রশ্নান্তর করাটা মহিম সাবধানে এড়াইয়া গেল।

ভিতরে সরোজিনী যে ভাবই পোষণ করুন না কেন, প্রকাশ্যে যেটুকু জানাইলেন, তাহার বেশী আশা করিতে গেলে পরিণামে তিক্ত গরল ব্যতীত আর কিছুই যে লাভ হইবে না, তাহা মহিম স্পষ্টই বুঝিল। উত্থাপিত প্রশ্নের যে উত্তর সে পাইয়াছে, তাহাকেই সিদ্ধান্তোপযোগী করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে মহিম তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিল—

"মা, আমার আইন পরীক্ষার আর দেরী নাই। ভাব্‌ছি..

কাল-পর্শুর মধ্যে কোল্‌কাতায় চ'লে যাবো। তুমিই কিছু কাজকর্ম্মগুলো দেখো। অবশ্য সরকারমশায় আছেন, কো বিষয়ে চিন্তা ক'রতে হবে না। হিসাবপত্রও তিনি মাস মা আমার কাছেই পাঠাবেন। তোমায় আর শেষ বয়সে ও-সব নিয়ে হাঙ্গামা ক'রতে হবে না।"

বক্র দৃষ্টিতে একবার বিপরীত দিকে চাহিয়া সরোজিনী সহাস্যে বলিলেন—"আচ্ছা।"

মায়ের সে দৃষ্টি ও হাসি মহিমের চক্ষু এড়াইল না। আদেশ পাইলেও, মহিম চিন্তিতভাবেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যা অনেকখানি গাঢ় হইয়া আসিয়াছে; চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ ছায়াময় পাহাড়ের কপোলে আকাশের মিলন-চুম্বনের মত আঁকা। দূরে তিন-পাহাড়ির উপর রূপালি আভাটুকু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আধো জ্যোৎস্না ও আঁধারে স্বপ্নলোকের মায়ায়—রাজমহলের কালো পাহাড় আর আমবনের উপর নিদ্রালু শুক্লা-সন্ধ্যা আবেশে ঢুলিয়া পড়িতেছে।

অবসন্ন মনে মহিম রমলাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রেই সে কলিকাতা রওনা হইবে। যাওয়ার পূর্ব্বে মেনকা ও রমলাকে তাহার মতামত জানাইয়া না গেলে, হয় তো তাঁহারা নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাবেন।

বাগানের ফটক তখনো খোলা ছিল। কাহাকেও না ডাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে সেই দিকেই প্রবেশ করিল। গাছগুলি নিঝুম দাঁড়াইয়া আছে; সেই তরল অন্ধকারের বুকে জমিয়া উঠা এক একটা দুশ্চিন্তার স্তূপের মত। জানালা দিয়া ঘরের খানিকটা আলো আসিয়া যে কয়েকটী গাছের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শুধু সেইগুলির মসৃণ পাতায় যেন জীবনের সাড়া ক্ষণে ক্ষণে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই, ঈষৎ চমকিয়া মহিম একবার দাঁড়াইল। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল ঘরের ভিতর। নিঃসঙ্কোচ সহজ-ভঙ্গীতে বসিয়া রমলা আপন-মনে এস্‌রাজ বাজাইতেছিল। রাগিণীর লীলা-স্রোতে আপনাকে এরূপ নিঃশেষে ডুবাইয়া দিয়াছে যে, কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সংযত বসন

কখন অলক্ষ্যে তাহার শাসনসীমা অতিক্রম করিয়া শ্লথ হইয়া প
য়াছে; দেহ-মন মাতাল হইয়া যেন সুরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

রমলা "পাহাড়ি" আলাপ করিতেছিল। করুণ মূর্চ্ছনা সা
নিস্তব্ধ বাড়ীখানির উপর বেদনার মূর্ত্ত নিঃশ্বাস ছড়াইয়া দিতে-
ছিল। কোন্ সে অজানা দরদীর মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ,
বিয়োগ-ব্যথার অফুরন্ত হাহাকার আজ এস্‌রাজের বুকে ফেনাইয়া
উঠিয়াছে। যেন কতকালের কত গোপন মান-অভিমানের
স্মৃতি প্রত্যেকটী 'মীড়ে' গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।
সেই দরদীর হারাণোর ব্যথা—প্রাণের অতল শূন্যতা আজ রমলার
নিপুণ সুন্দর আঙুলকয়টীর স্পর্শে জীবন্ত হইয়াছে। বেদনা-ম্লান
বাতাস যেন ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

সেইখানে দাঁড়াইয়াই মহিম তন্ময়ভাবে রমলার রাগিণী-আলাপ
শুনিতে লাগিল। রমলার এমন সহজ-সুন্দর রূপ সে পূর্ব্বে
কোনোদিন দেখে নাই। কবি-কল্পনার মানসী প্রতিমার মত
অপরিমেয় সৌন্দর্য্য মহিমের সারা মন আলোড়িত করিয়া তুলিল।
রমলা এত সুন্দর!

সবেমাত্র এস্‌রাজটী নামাইয়া রাখিতেছে, এমন সময় দরজায়
মৃদু আঘাত করিয়া মহিম ডাকিল—"রমল্!"

মহিমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমলা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল।
মহিম যে কখন আসিয়াছে তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই;
হয় তো অনেকক্ষণ হইতে ডাকিয়া সাড়া পায় নাই।

দরজা খুলিয়া, সলজ্জভাবে রমলা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বুঝি
অনেকক্ষণ এসেছ? শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে—"

কথা শেষ না হইতেই মহিম সহাস্যে বলিয়া উঠিল—"দাঁড়িয়ে কষ্ট পাই নি মোটেই। পেয়েছি অপার আনন্দ। এত চমৎকার এস্‌রাজ বাজানো আমি জীবনে শুনি নি।"

"যাও, ভারি দুষ্টু তুমি! চমৎকার না হাতী!" রমলা লজ্জারক্ত মুখে মহিমের পানে চাহিল।

আবার একটু হাসিয়া মহিম বলিল—"যাক্‌, তুমি এস্‌রাজও কি কাকীমার কাছেই শিখেছিলে?"

"হাঁ। ব'স।"

রমলা চৌকীখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া দিল।

বসিতে বসিতে মহিম বলিল—"সত্যি?—কাকীমা কোথায়?"

"পূজোর ঘরে। তুমি একটু ব'স; আমি চা তৈরী ক'রে আনি। তার মধ্যেই মা এসে পড়্‌বেন।"

রমলা যাইবার উদ্যোগ করিতেই, মহিম তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল; একটু চাপ দিয়া বলিল—"না; তোমায় যেতে হবে না। আমি এখন চা খাবো না।

রমলা একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহিমের মুখপানে চাহিল। মহিম যে একটা কিছু বলি-বলি করিতেছিল, তাহা রমলা মুখ দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মহিম বলিল—"জানো বোধহয়, আজ ভোরের গাড়ীতেই আমি কোলকাতা যাচ্ছি।"

"হাঁ।" রমলা মুখখানা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মন যেন সহসা জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ দু'জনেই নীরব রহিল। তরুণ দুইটী হৃদয়ে বলিবার

অনেক কথা জমা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিতে পারিতেছে না। তাহাদের বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা রমলা ও মহিম কাহারো অবিদিত ছিল না। প্রকাশ্যে সরোজিনীর মতামতের কথা কিছু না শুনিলেও, রমলা যতটুকু জানিয়াছিল, তাহাতে মহিমের চেয়ে তাহার আশঙ্কাই হইয়াছিল বেশী। মহিম পুরুষ, সে নারী; পক্ষ সমর্থনের কোনো ক্ষমতাই তাহার ছিল না।

একটা ঢোক গিলিয়া, যথেষ্ট সঙ্কোচের সহিত মহিম বলিল—"আচ্ছা রমল্! একটা কথা তোমায় জিগ্‌গেস্ ক'র্‌তে পারি কি? ঠিক্ উত্তর দেবে তার?"

মহিম রমলার মুখখানা এবার ভালভাবে লক্ষ্য করিল। আগে আগে মহিমের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়, এমন কি তাহাকে দেখিয়াই, রমলার মুখ-চোখে যে আনন্দ-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিত, সহসা যেন তাহা ম্লান রঙে ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার এই পরিবর্ত্তনটুকু মহিম কয়েকদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল।

রমলা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

"কথা বিশেষ কিছু নয়, তবে—"

মহিম পুনরায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমাদের বিয়ে নিয়ে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তা তোমার অজানা নাই বোধহয়। মায়ের মতামতের জন্যে যে আমাকেই বেগ পেতে হবে সব চেয়ে বেশী, তাও তুমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছো। তবে কথা কি, জানো? এই নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হবার আগে, আমি তোমার মতটা খুব ভাল ক'রে জেনে নিতে চাই। যাতে আমাদের

দু'জনকেই সারাজীবন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে, তাতে তোমার ইচ্ছা কতখানি।"

রমলা পাথরের প্রতিমার মত দৃষ্টি নত করিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা কোনো উত্তর সে দিতে পারিল না।

নিরুত্তর দেখিয়া মহিমের বুকের ভিতরটা অলক্ষ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল। খুব ধীরে মহিম অনুনয়ের সুরে বলিল—"তুমি কোনো সঙ্কোচ ক'রো না রমল্! তোমার অন্তরের কথা সরলভাবে খুলে' বল'। যদি তা অপ্রিয়ও হয়, আমি ব্যথিত হব না। তোমার সত্যিকারের ইচ্ছা আমায় অকপটে জান্‌তে দাও।"

তর্জ্জনীটি কামড়াইতে কামড়াইতে রমলা হাসিমুখে বলিল—"জানি না।"

মহিম দেখিল রমলার মুখ লজ্জায় রাঙিয়া উঠিয়াছে; সেই হারাণো-দীপ্তির রেশ।

"না রমল্! তুমি সত্যি বল'। কা'রো মুখচেয়ে তুমি মনের কথা গোপন ক'রো না।"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া, আবার সলজ্জ-হাস্যে রমলা বলিল—"তোমার যা ইচ্ছা।"

এবার একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া মহিম বলিয়া উঠিল—"এ তোমার নিতান্ত মনরাখা কথা।"

মহিমের কথায় বাধা দিয়া রমলা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—"মোটেই তা নয়। জীবনের যা সব চেয়ে বড় সত্য, সেই মৃত্যুকে সাক্ষী ক'রেই এর বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে।"

"রম—ল্!"—মহিম সাদরে রমলার হাতখানি কোলের কাছে

টানিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মহিমের বুকের কাণায় কাণায় আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছিল। দ্রুত হৃৎস্পন্দনে তাহার শিরা-উপশিরায় যে চঞ্চলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, রমলা বোধহয় হস্তস্পর্শেই তাহা অনুভব করিল।

কিছুক্ষণ কাহারো মুখেই কথা সরিল না। রমলা আর এবার মহিমের হাতের ভিতর হইতে নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া লইবার কোনো চেষ্টা করিল না। দু'জনেই আবিষ্টের মত পরস্পরের মুখপানে সমস্ত দৃষ্টিটুকু মেলিয়া একান্তভাবে চাহিয়া রহিল। আজ মহিম ও রমলা দু'জনেই যেন দু'জনের হৃদয়ের নিভৃত তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল।

সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাসে মহিমের মন একটু সজাগ হইয়া উঠিল। এবার সে লক্ষ্য করিল যে রমলার চোখদুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে মুখে বেদনার ছায়া নাই, আছে তৃপ্তির পরিস্ফুট ছাপ। রমলার সত্তা আজ আত্ম-নিবেদনের তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মহিম ধীরে ধীরে রমলার হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। হয় তো তাহার বুভুক্ষু হৃদয়, নিজের অজ্ঞাতসারেই, রমলার সেই যৌবন-সিক্ত সুকুমার আঙুলকয়টা চুম্বন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল—মেনকার কণ্ঠস্বরে। তিনি পূজার ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে ডাকিলেন—"রমল,—রমা!"

রমলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিল না। নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—"মা, মহিমদা এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে।" ... ...

সরোজিনীর নিকট মহিম যে অসরল সংক্ষিপ্ত আদেশটুকু পাইয়াছিল, তাহা মেনকাকে সবই জানাইল। মেনকা তাহাতে ঠিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তবে মহিমের এতখানি আন্তরিক আগ্রহ সরোজিনী ঠেলিতে পারিবেন না ভাবিয়া, যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন।

মেনকাকে প্রণাম করিয়া মহিম যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। ছোট্ট চাঁদখানি আকাশের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে।

মেনকা রমলাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, বাগানের পথটায় মহিমকে একটু আলো দেখাও তো। বড্ড অন্ধকার।"

মায়ের এরূপ আদেশ অপ্রত্যাশিত হইলেও, রমলা যেন ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সে লণ্ঠনটী হাতে করিয়া মহিমের পিছু পিছু চলিল। দু'জনের মনই বোধহয় অপূর্ব্ব আনন্দের দোলায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কেহই মুখ-ফুটিয়া কোনো কথা বলিতে পারিল না। ফটকের কাছে আসিয়া মহিম একবার দাঁড়াইল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"তা হ'লে চ'ল্লাম্ রম্।" ক্ষণেক থামিয়া, অতি মৃদুস্বরে আবার বলিল—"মনে থাকে যেন—!"

রমলা কোনো উত্তর দিল না; মহিমের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আশঙ্কা-জড়িত চিত্তে মহিম আর একবার রমলার মুখপানে চাহিল।

"ভয় হয়?"—দুষ্টু ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকাইয়া রমলা দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল। ইচ্ছা হইলেও, মহিম আর তাহাকে ডাকিবার সুযোগ পাইল না।

যাহা ছিল কল্পনার নিভৃত কোণে শুধু আশার ছবির মত, বিদ্যুৎ-প্রবাহে যেন রমলার অঙ্গে অঙ্গে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল—মহিমের বিদায়-বেলার স্পর্শে। আশা ও অনুভূতি লুটোপুটি করিয়া তাহার মনে যে পরিণতির আলোকপাত করিতেছিল, মেনকার চোখে তার সবটুকুই ধরা পড়িল।

মহিমের চিঠি পাইয়া মেনকা একুশে মাঘ বিবাহের দিনস্থির করিলেন। মীমাংসা যে এত সহজেই হইবে, তাহা তিনি আশা করিতে পারেন নাই। দিনস্থির হওয়ার কথা শুনিয়াও যখন সরোজিনী আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না, তখন মেনকা সত্যই তাঁহার প্রতি অকারণ দোষারোপের জন্য অনুতপ্তা হইলেন। আজ মেনকার ইচ্ছা হইতেছিল—সরোজিনীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়।

বিবাহের আর সাতদিন মাত্র বাকী। মেনকা স্থির করিলেন—নিজে গিয়া সরোজিনীর হাতে-পায়ে ধরিয়া তাঁহার প্রকাশ্য অনুমতি লইবেন। তিনি মহিমের মা; আর মেনকা অনাথা; তাঁহাদেরই আশ্রয়ে জীবন কাটাইতেছেন।

সন্ধ্যার পর সরোজিনী একা বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। তটিনীর পিছু পিছু মেনকা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সরোজিনীকে একইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তটিনী তাঁহার দৃষ্টি

আকর্ষণ করিবার জন্য অকারণ পূবের জানালাটা একবার সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু সরোজিনীর তন্ময়তা ভাঙিল না। এবার তটিনী ডাকিল—"মা" !

হরিনামের ঝুলিটী মাথায় ছোঁয়াইয়া বেশ ধীর স্বরে সরোজিনী বলিলেন—"কি ব'ল্‌ছো বৌমা ?"

শাশুড়ীর এতখানি মানসিক সুস্থতা তটিনী আজ বহুকাল পরে দেখিল। তাহার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ খাপ্‌ছাড়া। অনেকখানি ভরসা সঞ্চয় করিয়া তটিনী শাশুড়ীর পায়ের কাছে বসিয়া আব্দারের সুরে বলিল—"কে এসেছে, দেখ্‌ছেন মা ?"

সরোজিনী এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মেনকা সম্মুখেই দাঁড়াইয়া। সরোজিনী সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন "এই যে, আপনি !···বৌমা, তোমার মাকে একখানা আসন এনে দাও।"

মেনকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, আসনের দরকার নাই, এই বেশ বস্‌বো'খন।"

একটু লজ্জিতা হইয়া তিনি তটিনীর পাশে বসিয়া পড়িলেন। আজ সরোজিনীর সম্মুখে আসিয়া মেনকা যে ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সারা মন পূর্ব্বকৃত ত্রুটির জন্য ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। হয় তো মানসিক অশান্তির বশে সরোজিনী পূর্ব্বে কখনো রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইটুকুর জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে অতবড় একটা কদর্য্য ধারণা পোষণ করিয়া মেনকা কত বড় ভুল করিয়াছেন, তাহা আজ বুঝিলেন। সরোজিনীর নিকট তিনি যেন নিজেকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মেনকার চোখে জল আসিতেছিল। তিনি আর কোনোমতেই

নিজের ক্রটি ক্ষমা করিতে পারিতেছিলেন না। সরোজিনীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য তাঁহার মন আকুলি-ব্যাকুলি করিতে লাগিল।

সরোজিনী সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"তার পর! হঠাৎ গরীবের কথা কি ক'রে মনে হ'ল? আমি তো—"

বাধা দিয়া মেনকা বলিয়া উঠিলেন—"ছি, ছি, ও কথা ব'লে আর আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না। আমি অনাথা, কোনো রকমে আপনাদের আশ্রয়ে একটু মাথা গুঁজে প'ড়ে আছি। আপনাদের অনুগ্রহ না পেলে যে আজ আমার অবস্থা কি হ'ত তা ভগবান্ জানেন।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া মেনকা আবার বলিলেন—"আজো আবার আপনার চরণতলে এসেছি সেই অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'র্‌তে। রমলাকেও আপনার পায়ে একটু স্থান দিতে হবে। আপনি দয়া ক'রে এ ভিক্ষা না দিলে, আমার আর কোনো উপায় নাই। বাপ্-হারা মেয়ে—"

হঠাৎ সরোজিনীর মুখে দৃষ্টি পড়িতেই মেনকা থামিয়া গেলেন। চোখদুটি অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত করিয়া সরোজিনী যথেষ্ট শ্লেষের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"উপায় নাই কেন? রাজমহলে তো অনেক টোট্‌কা-বদ্যি আছে। আর বিয়ের ঝঞ্ঝাটে কাজ কি?"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া সরোজিনী হাসিলেন।

কথাটা শুনিয়া যেন মেনকা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। ইহার তাৎপর্য্যটুকু ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার মন ভীষণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। দুই হাতে সরোজিনীর পা জড়াইয়া মেনকা

আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন—"ওকি ব'ল্‌ছেন দিদি, আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনি দয়া ক'রে অনাথা মেয়েটার মুখ চেয়ে—"

"আঃ, পায়ে হাত দেবেন না।" পা দু'খানি টানিয়া লইয়া, সরোজিনী আরো ঝাঁজের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"বিয়ে কি ওদের হ'তে বাকী আছে? আর মিছেমিছি, এখন দায়ে ঠেকে, ধর্ম্মকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কেন? ধিঙ্গী মেয়ের টোপ্ ফেলে, ছেলেটার গলায় বঁড়শী বিঁধিয়ে, এখন ঢং ক'র্‌তে এসেছেন। লজ্জা করে না? আবাগীরা এমনি ক'রে আমার সোণার সংসারটা ছারখার ক'রে দিলে।"

একটা অস্ফুট কাতর শব্দের সঙ্গে মেনকা হতবাক্ হইয়া পড়িলেন। বুকের ভিতর তীব্র বিষ-বাণের খোঁচা লাগিয়া যেন তাঁহার সর্ব্বশরীর পঙ্গু হইয়া গেল; পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তটিনীও অসাড়, নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। 'মানুষের বুকে আর কত জ্বালা সহ্য হয়! এ দুর্ভাগ্যের মর্ম্মান্তিক পূর্ণাহুতি কি আর শেষ হবে না!'

সরোজিনীর বাক্য-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, লজ্জায় ঘৃণায় আজ প্রায় পাগলের মত টলিতে টলিতে মেনকা বাড়ী ফিরিলেন। রমলা উদ্‌গ্রীব হইয়া মায়ের অপেক্ষায় ছিল। মেনকা ও-বাড়ী যাওয়ার পর হইতেই তাহার মনে একটা আতঙ্ক ক্ষণে ক্ষণে আঘাত করিতেছিল। মেনকা ফিরিতেই, রমলা সেই আতঙ্কের ছায়া

পরিস্ফুট দেখিল—মায়ের মুখে; নিমেষে সকল আশার আনন্দ যেন গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। মেনকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। নিজের উপর বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। শুধু তাহার বিবাহ লইয়াই যখন এত অশান্তি, তখন সে বিবাহের প্রয়োজনই-বা কি? জীবনে যেটুকু সম্বল পাইয়াছে, তার স্মৃতি লইয়াই তো সে অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। যদি জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যাই কখনো বড় হয়, পরের বাড়ী রাঁধুনিগিরি করিবে; প্রয়োজন হইলে, উপবাসে কাটাইয়া জীবনের দিনগুলি সার্থক করিয়া লইবে; তবুও অপার শান্তি। শুধু আশ্রয়ের জন্য যেখানে বিবাহের বাঁধন, সেখানে মৃত্যুই ভালো।

অবসন্ন মনে রমলা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে গেল।

ঠিক নিদ্রা নয়: একটা অবসাদ-তন্দ্রা—শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছবি ও অসংলগ্ন স্বপ্নের জাল রমলার সংজ্ঞাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। হয় তো দেখিতেছিল—নিজেরই জীবনের খণ্ড খণ্ড কল্পনা ও অনুভূতির ছায়া-চিত্র। সহসা সে চমকিয়া উঠিল, চাপা কান্নার শব্দে। বাহিরের সমস্ত কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। ঘরের আলোটি তখনো সেইভাবেই জ্বলিতেছিল। মেনকা বিছানায় পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছেন। রমলা ক্ষণেক বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল; কোনো কথাই সে ভাবিতে পারিতেছে না, মনটা তখন দারুণ শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীবনের অত আনন্দ,

খেলা, হাসি, এই তো ছিল সেদিন! কেমন করিয়া যেন ঘোলা হইয়া উঠিল সব! কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা রমলার বুকের পাঁজরা কয়খানির ভিতর একবার নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল।

"মা!" দুই হাতে মেনকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রমলা ডাকিল—"মা, মা!"

মেনকা মুখ তুলিয়া রমলার পানে একবার চাহিলেন। চোখের জলে তাঁহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা; তবুও যেন সহসা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মায়ের চোখে এ আগুন রমলা কখনো দেখে নাই। মেনকার অবস্থা দেখিয়া, রমলা নিমেষে অনেক-কিছুই বুঝিয়া লইল। অনাথা মায়ের জীবনে যে বিপর্য্যয়ের ঝড় আজ উঠিয়াছে, তাহার মূলে রমলা নিজেই; এ-কথা মনে হইতেই রমলার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল! সে চোখের জল আট্‌কাইতে পারিল না; একান্ত মনে প্রার্থনা করিল—নিজের মৃত্যু, সবকিছুর অবসান।

সজল চোখে রমলাকে হেঁট হইতে দেখিয়াই বোধহয় মেনকার অন্তরের গোপন মাতৃত্বটুকু কাঁদিয়া উঠিল। বিদ্যুৎবেগে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া, মেনকা আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন—"রুমি, মা,—মা আমার, তুই অভাগীর পেটে কেন জন্মেছিলি মা?" মেনকার চোখের জল আর বাধা মানিল না; ঝর্ ঝর্ করিয়া রমলার মাথায় ঝরিয়া পড়িল। রমলাও মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তাহার অন্তরের আর্ত্তনাদ সহসা যেন সেই স্নেহস্পর্শে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

মেনকা চিরদিনই তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি কাতর ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দীন হইতে পারেন নাই। সরোজিনীর নিকট যে অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া সেদিন ফিরিলেন, তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই বেশ দৃঢ় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নির্ব্বাপিত-প্রায় তেজস্বিতা আবার আপন-গৌরবে জ্বলিয়া উঠিল। মেনকা স্থির করিলেন: নিজের যাবতীয় সম্বল নিঃশেষে ব্যয় করিয়াও, অন্যত্র রমলার বিবাহ দিবেন; তবু সরোজিনীর অনুগ্রহ প্রার্থনা জীবন থাকিতে করিবেন না। পরলোকগত স্বামীর পবিত্র স্মৃতির অবশেষটুকু ঐরূপে কালিমালিপ্ত করিবার অবকাশ তিনি সরোজিনীকে আর দিবেন না।

সতীনাথের বন্ধু তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ডাকিয়া, মেনকা অবিলম্বে কিরণের সঙ্গে রমলার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন—নির্দ্দিষ্ট দিনেই। কিরণকে মেনকা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। ধূলিয়ানে থাকিতে—কিরণ কয়েকবার আসিয়াছিল মহিমের সঙ্গে। তবে তখনকার সেই ছাত্র-কিরণের জীবনের গতি আজ বহু নীচে নামিয়া গিয়াছে: অধঃপতনের চরম সীমায়। সে-কথাও মেনকার অবিদিত ছিল না, তবু কিরণের সঙ্গেই তিনি রমলার বিবাহ দিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। ইহার ভিতরে যে কি যুক্তি ছিল, তাহা তিনিই জানিতেন। মেনকা নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাতে অপরের যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখিতেন না।

রমলা সমস্তই শুনিল। এ বিবাহ-প্রস্তাব তাহার প্রাণে যে মর্ম্মন্তুদ যাতনার সৃষ্টি করিল, তাহা মেনকা কেন, জগতে আর কেহই বুঝিবে না। যে সমাজ ও নীতির মধ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই পবিত্র ছায়ায় পিতার মঙ্গলাশীষ মাথায় লইয়া. সে আপনমনে পূজার বেদী সাজাইয়াছিল। আজ সহসা একটা বিপর্য্যয়ের ঝড়ে, তাহার গোপন আশা ও আকাঙ্ক্ষা এরূপ নিঃশেষে চূর্ণ হইতে দেখিয়া রমলার অন্তর বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। জীবনের সকল ব্যথা সে জুড়াইত মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া; আর আজ মা নিজেই তাহার এই ব্যথার আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন। মেনকা এই কয়দিন এমন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, রমলা তাঁহার নিকট কোনো অভিযোগই জানাইতে সাহস করিল না। মায়ের দৃঢ়তা ও কঠোরতার মাত্রা রমলা ভালভাবেই জানিত।

অশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে রমলা মহিমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মহিমের ফিরিবার কথা ছিল—উনিশে মাঘ সকালের গাড়ীতে। মহিম আসিলে, যেমন করিয়া হউক এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস রমলার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উনিশে মাঘ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন সে মহিমের দেখা পাইল না, তাহার উদ্বেগ সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল। রমলা অধীর হইয়া উঠিল। যাহা অন্তরের সরল সত্য, তাহা লইয়া সে মাথা তুলিবে না কেন? তাহার হৃদয়ের যাবতীয় সম্পদ পোড়াইয়া ফেলিবার এই যে আয়োজন—এই ষড়যন্ত্র—ইহার প্রতিবাদ সে করিবেই। মা আজ যে উপায়ে রমলার

জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা তো আনন্দময় বিবাহ-বন্ধন নয়; বলিদানের যূপ-পাশ।

মেনকা আনমনে কি লিখিতেছিলেন। রমলা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিল। মেনকা একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না। মেনকার মনেও হয় তো দুশ্চিন্তার গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মুখের সহজ শান্তভাব একটা অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ঘরের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে, কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া রমলা ডাকিল—"মা!"

কোনো উত্তর না দিয়া, মেনকা রমলার মুখপানে চাহিলেন। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তপ্ত হাওয়ার মত সে দৃষ্টি শুষ্ক ও নির্মম। মায়ের চেহারা দেখিয়া রমলা মনে মনে বেশ একটু ভয় পাইল। কপালটা কুঞ্চিত করিয়া, মেনকা আর একবার রমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই বিয়েতে তোমার খুবই আপত্তি আছে, সেই কথা জানাতে এসেছ; কেমন?

রমলা চমকিয়া উঠিল। সহসা কোনো উত্তর সে দিতে পারিল না। মায়ের কথায় তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। রমলা জোর করিয়া আজ সমস্ত লজ্জা-ভয় ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। মেনকা যদি

আজ রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে রমলা বোধহয় এতো বিব্রত হইয়া পড়িত না। কিন্তু মেনকার কথায় তিরস্কারের কোন গন্ধও ছিল না ; ছিল তীব্র শ্লেষ।

নিজেকে একটু সবল করিয়া লইয়া, রমলা সসঙ্কোচে বলিল—"মা, তুমি—"

বাধা দিয়া মেনকা আবার কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তোমার কোনো কথা আমি শুন্‌বো না, শুন্‌তে চাই না।"

এবার রমলার অন্তর হঠাৎ তাতিয়া উঠিল। প্রতিবাদ করিয়া, সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—"যদি শুন্‌বেই না আজ, তবে ছেলেবেলা থেকে আদর্শগুলো অত বড় ক'রে দেখিয়েছিলে কেন? আমায় এমনি ক'রে তৈরী ক'র্‌লেই পার্‌তে! তুমিই তো—তুমিই তো আমার—।"

রমলার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল ; তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বিস্ফারিত নেত্রে মেনকা কন্যার মুখপানে চাহিলেন। তাঁহার চোখের সেই উগ্রদৃষ্টি আচম্বিতে শূন্যতায় ভরিয়া উঠিল ; অসহায়-ভাবে যেন একটা আশ্রয় খুঁজিতেছে।

এইটু সংযত হইয়া রমলা এবার ধীরস্বরে বলিল—"আমি তা পার্‌বো না মা, এতদিন ধ'রে যাঁকে মনে মনে—"

রমলার এ ধৃষ্টতায় মেনকা আবার জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"চুপ্ কর ডেঁপো মেয়ে। ও জ্যাঠামি আমার কাছে চ'ল্‌বে না। ঐ কিরণের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো। দেখি, তুই কি ক'র্‌তে পারিস্!"

রমলা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আজ সে মরিয়া হইয়াছিল। যেমন করিয়া হউক, আজ শেষ মীমাংসা করিয়া লইবে। অবস্থা যে এতো প্রতিকূল হইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রমলা ক্ষণেক কি ভাবিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল— "তা' হ'লে আমিও—।"

"বিষ খেয়ে মর্‌বি; কেমন?" মেনকা হাসিয়া উঠিলেন। হাসি নয়, সে যেন একটা বিকার; জনহীন মাঠে ঘূর্ণী বাতাসে নাচিয়া উঠা রাশি রাশি শুষ্ক ঝরা-পাতার ঝন্ ঝন্ শব্দের মত আতঙ্ককর।

অবসন্নভাবে রমলা মাটিতে বসিয়া পড়িল। জোর করিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রমলা আজ মেনকার কথায় পলে পলে বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছিল। তাহার অবাধ সরল মনের গতি মায়ের কাছে কোনোদিনই এতো লাঞ্ছনা পায় নাই। মাও বুঝিল না তাহার দুঃখ। রমলার জীবনে কত ব্যথা, কত হাহাকার যে শুধু এইটুকুকে ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা মেনকাও একবার ভাবিলেন না।

রমলা কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই মেনকা আবার রুক্ষস্বরে বলিলেন—"যদি অতোই তেজ থাকে, তাহ'লে যা পারিস্ কর্। বাপের মেয়ে হ'লে, মুখ বন্ধ ক'রে সহ্য ক'র্‌বি। মন তোর নিজের, মনে মনে তুই যা খুসী ক'র্‌গে; তা'তে আমার কোনো আপত্তি নাই।"

দ্রুতপদে মেনকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

'উঃ! মাকেও কেন এমন কঠোর ক'রে তুল্‌লে ঠাকুর! একথা মায়ের মুখ থেকে কখনো শুন্‌বো ভাবি নি।' আঁচলে মুখ ঢাকিয়া রমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঘরের মেঝেয় পড়িয়া রমলা যে কতক্ষণ কাঁদিয়াছে তাহার ঠিক নাই। রমলার মাথার কাছে বসিয়া মেনকা ধীরে ধীরে ডাকিলেন—"রুমি, মা আমার! তুইও কি আমার সঙ্গে এমনি ক'রবি?"

মায়ের স্পর্শে রমলার বুকের সমস্ত বেদনা যেন এক সঙ্গে উথলিয়া উঠিল। সে আরো ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমলা আজ আর কোনোরূপেই কান্না চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, রমলার জীবন ততদিন হাসির ফোয়ারায় ভরা ছিল। পিতার কত স্নেহ, কত আদর, কত ভালবাসা সে পাইয়াছে। আর আজ?

রমলাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মেনকা বলিলেন—"আমায় ভুল বুঝিস্‌না মা। আমি যে সংসারে শুধু তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। আমি কত দুঃখে তোর ওপর এমন হ'য়ে উঠেছি, তা ভগবান্‌ জানেন। আমি কি জানি না মা, তোর প্রাণে এতে কত আঘাত লাগ্‌বে? আমারও যে বড় আশা ছিল রমল্‌, তোকে আমি মহিমের হাতেই তুলে' দেবো। কিন্তু তা হবার নয়। পাগ্‌লি, তুই মুখ-ফুটে কোনো কথা না ব'ল্‌লেও, আমি তোর মনের কথা সবই জানি। আমি যে—মা। মায়ের মন সব জান্‌তে পারে রে। ছেলের

গোপন সুখ-দুখ সবই যে মায়ের চোখে ধরা প'ড়ে যায়, মা। তা নইলে কি— ।" মেনকার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া, রমলা দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত রোদনের সুরে বলিয়া উঠিল—"মা, আমি পারছি না মা!"

"এ ছাড়া যে আর কোনো পথ নাই রমল্।" তাঁহার চোখে জল আসিতেছিল। মেয়ের মনের এই ব্যথায় তাঁহার বুকের ভিতরটা টন্-টন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু নিরুপায়। চোখের জল মুছিয়া, রমলার এলোমেলো চুলগুলিকে গুছাইতে গুছাইতে মেনকা আবার বলিলেন—"আমি সব জানি মা; সব শুনেছি। তোমার বাবার মরণকালের ইচ্ছা—নিতান্ত নিরুপায় না হ'লে কি আমি— ।"

কান্নার বেগে মেনকার ভাষা জড়াইয়া আসিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তিনি মনের কষ্ট চাপিয়া রাখিতে পারিতে ছিলেন না। রমলাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া মেনকা নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিলেন। চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—স্বামীর স্মৃতি, আর মৃত্যুকালের শেষ ইচ্ছাটুকুর কল্পিত ছবি।

অনেকক্ষণ পর সেই নীরবতা ভাঙিয়া রমলা অনুনয়ের সুরে বলিল—"তা হ'লে, আমি যেমন আছি, এমনি তোমার কাছে থাক্‌বো মা। আমায় আর কারো হাতে তুলে' দিও না।"

মেনকা যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন। আর একবার আগাগোড়া ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"তারো উপায় নাই রমল্! নইলে তাই ক'রতাম্। কিন্তু মা, তোর বাবা,—দেখেছিস্ তো, কেমন শিবের মত মানুষ ছিলেন তিনি,—তাঁর নামে, তাঁর

বংশের উপর এমন ক'রে কলঙ্কের কালি মাখাতে আমি কা'কেও দেবো না। তোর বিয়ে অন্যত্র না দিলে, তারা সেই কথাই রটাবে। ছিঃ, সে ঘেন্না আমি প্রাণ থাকতে সইতে পারবো না। তোর বিয়ের জন্যে যেদিন পায়ে ধ'রতে গেলাম্, সেদিন কি ব'ল্লে জানিস্?—না, না, সে কথা আর শুনে কাজ নাই। আমি তা মুখে আনতে পারবো না। আমরা কাঙাল হ'তে পারি, কিন্তু তাই ব'লে এখনো অতো হীন, অতো নীচ হ'য়ে যাই নি।"

এতো জোরে জোরে মেনকার নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল যে, সেই নিস্তব্ধ ঘরখানাও যেন সেই শব্দে সজাগ হইয়া উঠিল।

দীর্ঘকাল মেনকা ও রমলা কাহারো মুখেই কোনো কথা সরিল না। উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া কি ভাবিতেছিল। হয় তো সেই নিস্তব্ধ গৃহকোণে বসিয়া, মা ও মেয়ে—পরস্পরকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিয়া—দু'জনে দু'জনের বুকের দরদটুকু কাণ পাতিয়া অনুভব করিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনেই কিরণের সঙ্গে রমলার বিবাহ হইয়া গেল, এক পক্ষের আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং অন্য পক্ষের গভীর ব্যথা ও শূন্যতার মাঝখানে। অন্তরে যাহাই থাক্, রমলা আর কোনো আপত্তি করিল না। আপনার মর্য্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুষ্ঠানের সব-কিছুই সে মুখ বুঁজিয়া পালন করিয়া গেল; তবে বিবাহের মন্ত্র রমলা একটীও উচ্চারণ করিল না। অন্যে লক্ষ্য না করিলেও, তাহা কিরণের দৃষ্টি এড়াইল না।

যে অদম্য খেয়ালে মেনকা অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিবাহের পরমুহূর্ত্তেই তাহা দারুণ আত্মগ্লানিতে পর্য্যবসিত হইল। অন্যের একটা অবান্তর মন্তব্যের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তিনি রমলার বাস্তব জীবনকে জোর করিয়া চিরদিনের মত ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই কথা ভাবিয়াই মেনকার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। রমলা যখন তাহার কুমারী-জীবনের হাস্য-চঞ্চল আলোর স্মৃতিগুলি মায়ের হৃদয় হইতে নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া লইয়া, নীরবে রাজমহল ছাড়িয়া গেল, মেনকার মাতৃ-হৃদয় একটা আর্ত্তনাদের সহিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাঁহার অন্ধকার বুকের ভিতর অহরহঃ জাগিতে লাগিল রমলার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখ দুটীর শেষ ব্যর্থ-চাহনি—সীমাহীন শূন্যতা আর অসহায়-তায় ভরা।

আজ আর রাজমহলের কোনো-কিছুই রমলাকে আকর্ষণ করিল না; শুধু একখানি ছবির মায়া তাহার সারা প্রাণ ছাইয়া রহিল। শত চেষ্টা করিয়াও রমলা মহিমের ছোট ফটোগ্রাফ্‌খানি ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। দ্বিধা ও সঙ্কোচ তাহাকে পলে পলে বাধা দিল। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে রমলা বার-বার সেখানি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া এখানে ওখানে গুঁজিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সযত্নে বাক্সের ভিতরেই তুলিয়া রাখিল। এই ছবিখানি মহিম একদিন আদর করিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। সেদিন ইহা রমলার বুকে জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল—

এক অপূর্ব্ব আশার স্বর্ণ-প্রদীপ ; আর আজ তাহা হইল রমলার জীবনব্যাপী হতাশার পথে স্মৃতির শেষ সম্বল।

রমলা রাজমহল ছাড়িয়া গেল—ঠিক যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। তাহার মনে আশারও কোনো ছায়া ছিল না, হতাশার উত্তাপও মিলাইয়া গিয়াছিল। রমলা যেন সহসা কেমন হইয়া গিয়াছে। জীবনের অতীত ও বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশিয়া, এমন একটা গুরুভার পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, রমলার শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত তাহাতে থামিয়া যাইতেছিল। ঘূর্ণীর আবর্ত্তে পড়িয়া প্রজাপতি যেন দিগন্তের পানে ছুটিয়া গেল, বাতাসের ঘাত-প্রতিঘাতে চেতনাহীন, শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত ; তাহার উৎসবের আরতি-দীপ দপ্ করিয়া নিবিয়া যায়, ফুলের স্মৃতি ও মধুর নেশা প্রাণের ভিতর মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ; যাওয়ার পথেও তাহার উদ্দেশ্য থাকে না, বাঁচিবার আশা করিতেও সে ভুলিয়া যায়—অবসর পায় না—আকর্ষণ থাকে না ; রমলাও ঠিক তেমনি করিয়া রাজমহল হইতে দূরে সরিয়া গেল—যেন একখানা বান্‌চাল হওয়া জীর্ণ নৌকা।

রঘুনাথগঞ্জে আসিয়াও রমলার মনের কোনো পরিবর্ত্তন হইল না ; তবে কিরণের সংসারে অভিভাবক নাই দেখিয়া, সে অনেকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এ যেন ঠিক তাহারই মনের সঙ্গে সুর-বাঁধা একটা দেউলিয়া সংসার ; আগাগোড়া জীর্ণ ও বিশৃঙ্খল। মাঝে মাঝে অতীত সম্পদের স্মৃতি জড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার গৌরবটুকু

নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। এত বড় নির্জ্জন পুরীর মধ্যে কিরণের সঙ্গে বাস করিবার কল্পনাও যে রমলার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, তাহা নহে ; তবে রমলা অনেকখানি সাহসে বুক বাঁধিল— সেই মরুময় পথের স্নিগ্ধ পান্থপাদপ লীলাকে পাইয়া।

লীলাকে অবলম্বন করিয়া রমলা কোনো রকমে দিনের পর দিন কাটাইতেছিল। সংসারের ভার হাতে তুলিয়া লইলেও, সে কিরণের পত্নীত্বটুকু যেন ঠিক মাথা পাতিয়া লইতে পারিল না। কিরণ তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যতই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, রমলাও সর্ব্বপ্রযত্নে ততই দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিরণ দমিবার পাত্র নয়। বিবাহের দিন হইতেই তাহার মনে যে দ্বন্দ্ব পড়িয়াছে, অন্ততঃ সেইটুকু যাচাই করিয়া লইবার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর মাঝে মাঝে প্রবল তেজে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার অন্তরের অতৃপ্ত লিপ্সা! রমলার অপরিমেয় সৌন্দর্য্য কিরণের মনকে ক্রমেই মাতাল করিয়া তুলিতেছিল।

সেদিন দুপুরে, খাওয়ার পর রমলা লীলাকে সেলাই শিখাইতে বসিয়াছিল। এ সময় কিরণ কোনোদিনই বাড়ীর মধ্যে আসে না। কিন্তু আজ হঠাৎ ঝ'ড়ো বাতাসের মত তাহাদের ঘরের মধ্যেই আসিয়া হাজির হইল। কিরণকে দেখিয়া রমলা যেন একটু থতমত খাইয়াই সসঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াইল। কিরণও বোধহয় সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কিরণ লীলার হাতের কাপড়টুকু টানিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ, বেশ তো সেলাই শিখেছিস্ রে।"

দাদার এই সস্নেহ ব্যবহারটুকুতে লীলা অনেকখানি গর্ব্ব অনুভব করিল; আনন্দে তাহার চোখদু'টি চক্ চক্ করিয়া উঠিল। কিরণের সম্মুখে আজ বহুদিনের পর নূতন সাহস সঞ্চয় করিয়া লীলা আব্দারের সুরে বলিল—"আমায় কাপড় এনে দিও দাদা! আমি বৌদির কাছে রুমাল শিখ্‌বো। তোমার অনেক রুমাল ক'রে দেবো।"

"আচ্ছা।" বলিয়াই, রমলার পানে এক পলক চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে কিরণ বলিল—"ও হো! লিলি, যা তো রে —শিগ্‌গির। দেখ্‌গে, তারা-হালদারের বৌ তোকে কি জন্যে ডাক্‌ছিল। খুব দরকার প'ড়েছে কিসের।"

রমলার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আজ সহসা এমন সময় কিরণকে বাড়ীর মধ্যে আসিতে দেখিয়াই সে মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল লীলাকে ডাকিয়া নিষেধ করে; কিন্তু পারিল না লীলা ঘর হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রমলা ত্রস্তপদে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। এমন সময় কিরণ বাধা দিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

কিরণের দৃঢ় মুষ্টি হইতে রমলা সহজে মুক্ত হইতে পারিবে না বুঝিয়াই বোধহয় কাতরভাবে বলিল—"মাপ করুন; আমায় ছেড়ে দিন্। এখুনি কে এসে প'ড়বে; লীলা—।"

"সে ভয় আমি করি না। তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া ক'রে নিতে চাই। এমন ক'রে তোমায় আমি গায়ের জোরে আট্‌কাতে চাই না। এখানে যে নিতান্ত অনিচ্ছায়

অমন মন-মরা হ'য়ে পড়ে থাকবে, তাই ব'লে তো বিয়ে ক'রে আনি নি। আমার বাড়ী যদি তোমার কয়েদখানা ব'লেই মনে হয়, তবে খুলে বল। আমি আজই তোমায় রাজমহলে রেখে আস্‌বো; কোনো দুঃখ বা আপত্তি আমার নাই। কিন্তু আমি তোমায় রাত-দিন এমন মন-মরা দেখ্‌তে পার্‌বো না।"—কিরণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার রমলার মুখপানে চাহিল।

'এ কি! এ যে সমবেদনার সুর! দরদ—সহানুভূতি!' রমলা আরো ভয় পাইল। তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। কিরণের কাছে এরূপ সহানুভূতি রমলা চায় না। সে চায় উপেক্ষা, নির্ম্মম—কঠোর নির্য্যাতন। আপনাকে সে বঞ্চিত করিতে পারিবে, কিন্তু কিরণ যদি সরল বিশ্বাসে একবিন্দুও ভালবাসিয়া থাকে; রমলা তাহাকে বঞ্চনা করিবে কিরূপে!

রমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া, কিরণ তাহার হাত ছাড়িয়া বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল—"আমি কোনো বিষয়েই তোমার উপর জুলুম্ ক'র্‌বো না; সে ইচ্ছাও আমার নাই। তবে তোমার কাছ থেকে আমি আমার পাওনার সীমাটা জেনে নিতে ইচ্ছা করি। নইলে, অকারণ দুর্ভোগের বোঝা বাড়তে থাক্‌বে। তুমিও শান্তি পাবে না, আমিও না।"

উত্তরের আশায় কিরণ একদৃষ্টে রমলার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু রমলা কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গিয়াছিল, তাহাতে রমলার ভাষা ও বুদ্ধি যেন সহসা চৈতন্যহীন হইয়া পড়িল। সে কি তবে আগাগোড়া কিরণের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া আসিয়াছে!

কিরণকে সে ভুল বুঝিয়াছিল কিনা, বলা যায় না; তবে কিরণ এবার রমলার এই মৌনতাটুকু সম্পূর্ণ ভুল বুঝিল। এই নীরবতার ভিতর কিরণ যে উত্তরের ইঙ্গিত অনুমান করিয়া লইল, সেই ভিত্তির উপর মুহূর্ত্তে তাহার সারা অন্তরভরা এক কল্প-প্রাসাদ গড়িয়া উঠিল। কিরণ উন্মনা হইয়া রমলার ঘাড়ে হাত রাখিয়া ঈষৎ ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। একটা আবেগ—একটা উচ্ছ্বাসে সে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছিল।

কিরণের স্পর্শে চকিতে রমলার সমস্ত সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। ক্ষিপ্রভাবে নিজেকে মুক্ত করিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখে যে দারুণ আর্ত্তভাব তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া কিরণ চমকিয়া উঠিল। মনে মনে অনেক কথা তোল্‌পাড় করিলেও, বস্তুতঃ তাহাদের সম্বন্ধ-সূত্রটা যে এতখানি আল্‌গা, তাহা কিরণ একদিনের জন্যও ভাবিতে পারে নাই। দেনা-পাওনার খাতায় যে গর্‌মিল ছিল, তাহা সে অনেকখানি উপেক্ষা করিয়াছিল, 'ঠিকে-ভুল' ভাবিয়া। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল —হয় তো সেটা অঙ্কের ঘরেই ফাঁকি। কিরণ সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। রমলা নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটির উপর অকারণ দাগ কাটিতেছিল—বোধহয় নিজেকে একটু আন্‌মনা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায়।

কিরণ ও রমলা কাহারো মুখেই কিছুক্ষণ কথা সরিল না। উদ্‌গত ক্রোধ যথাসাধ্য চাপিয়া, কিরণ পুনরায় বেশ ধীর ও দৃঢ়স্বরে বলিল—"এ বিয়েয় তা হ'লে তোমার গোড়াতেই আপত্তি করা উচিত ছিল রমলা! তাতে তুমিও সুখী হ'তে পার্‌তে, আমার

জীবনেও মিছেমিছি একটা অশান্তির বোঝা আস্‌তো না। তুমি যে মনে মনে অন্য কা'কেও ভালবাসো, তা আমি সন্দেহ ক'রেছিলাম সেই বিয়ের দিনই—"

"না—না।" রমলা কিরণের পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িল। কিরণের কয়েকটি কথা যেন তাহার বুকে আজ হাতুড়ি পিটাইয়া দিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রমলা উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—"না—না। আমাকে মাপ করুন। আমার মনটা তৈরী ক'রে নেবার একটু সুযোগ আমায় দিন; কয়েক দিনের অবসর—।"

"আচ্ছা।" কিরণ আর কোনো কথা না বলিয়া, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমলা মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবনে—চলিবার পথে যে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে মাঝে মাঝে তাহার বিহ্বল অন্তর এমনি করিয়া কাঁদিয়া হাল্‌কা হইতে চাহিত। সাম্‌নের দিকে সে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না; বর্ত্তমান-পথের আলোটুকুর উপর নির্ভর করিতেও তাহার ভয় হইতেছিল; অথচ এটুকু হারাইবার কথা ভাবিতেও সে অস্থির হইয়া পড়িতেছিল।

কিরণ চলিয়া গেলে রমলা অনেকক্ষণ স্থাণুর মত সেইখানেই পড়িয়া রহিল। আজ আবার সেই সব পুরাণো দিনের কথায় তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। আকাশ পাতাল—নানা ভাবনাকে সে জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পারিল না। মহিমের উপর আজ তাহার অত্যন্ত

ঘৃণা হইতেছিল। মহিমের পায়ে সর্ব্বস্ব ডালি দিতে গিয়া, সে তাহার জীবনটা বিষাক্ত ও দেউলিয়া করিয়া তুলিয়াছে। আর মহিম! সামান্য একটা অশান্তির ভয়ে, নিশ্চিন্তে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। এই দেড় মাসের মধ্যে একবার রমলার সংবাদটুকু লইবার অবসরও তাহার হইল না। তবে কি—সে শুধু তাহার দেহের লোভে······, রমলা আর ভাবিতে পারিল না; অশ্রদ্ধা ও গ্লানিতে তাহার মন ভরিয়া গেল; রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

······'কিন্তু—মহিমদা—!' রমলা আবার তেমনি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহিমকে ঘৃণা করিতে গিয়া তাহার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে।

এবার সমস্ত অভিমান গড়াইয়া পড়িল নিজের উপর। আজকার এই অকারণ দুর্ব্বলতা ও ভঙ্গুরতাটুকুকে সে নিজেও ক্ষমা করিতে পারিল না।

ক্রমে ক্রমে রমলা অনেকখানি সবল হইয়া উঠিল। অতীতের স্তূপ হইতে মনটাকে দূরে টানিয়া রাখিবার আশায় সংসারের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন কাজের ভিতর রমলা আপনাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিল। কিরণের ছন্নছাড়া জীবনটাকে গুছাইয়া তুলিবার জন্য সে সর্ব্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিরণের ইহাতে কতখানি তৃপ্তি ছিল জানি না, তবে রমলা তৃপ্তি পাইত অনেকখানি, অন্ততঃ নিজের কর্ত্তব্যের দিক্ দিয়া। কিরণকে সে সুখী করিতে পারিবে না—তাহা বেশ বুঝিলেও, কার্য্যতঃ রমলা তাহার সেবা-যত্নের ভার আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল—কিরণের জীবন হইতে এই অশান্তিটুকু মুছিয়া লইবার আশায়। তবে, যে দেহখানাকে তাহার মনের গলা টিপিয়া ছিনাইয়া লইয়া—মেনকা জোর করিয়া কিরণের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই দেহটাকে রমলা আজো কিরণের শয্যায় ডালি দিতে পারিল না।

মহিমকে ভুলিবার জন্য রমলা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু একদিকে সে মহিমের স্মৃতিকে যতই এড়াইয়া চলিতে চায়, অন্যদিকে তাহার মনের কোণে অভিমানের সুর ততই তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। তাহার সম্বন্ধে মহিমের এতখানি উদাসীনতা সে যেন কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। রমলার যখন সবচেয়ে বড় দুঃসময়, মহিম তখনই নীরব হইয়া গেল; রমলা যখন স্রোতের মুখে অকূলের পানে ভাসিয়া চলিল, মহিম তখন তীরে দাঁড়াইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে রমলার মন তিক্ত হইয়া উঠে। অসহ্য ব্যথায় সে পাগল হইয়া

পড়ে; কাঁদিয়া বুক ভাসায়। ভুলিতে গিয়া মহিমকে সে আরো বেশী করিয়া ভাবে; মহিমের স্মৃতি তাহার সারা অন্তর ভরিয়া তোলে।

রমলা যখন সত্য সত্যই অনেকদিন ধরিয়া মহিমের কোনো খবর পাইল না, তাহার অভিমানকে ছাপাইয়া ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠার ছায়া মনটা কালো করিয়া তুলিল। স্থির হইতে গিয়া, রমলা আবার অস্থির হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধরাত্রে, লীলা যখন ঘুমাইয়া পড়ে, রমলা উঠিয়া বসে। অতি সন্তর্পণে বাক্স হইতে মহিমের ছবিখানি বাহির করিয়া বার-বার কপালের উপর চাপিয়া ধরে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; তবু আলো জ্বালিতে রমলার ভয় হয়, পাছে লীলা জাগিয়া উঠে। দুশ্চিন্তার কাঁড়ির ভিতর তাহার ঘুমটুকু হারাইয়া, রমলা শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদে; আশঙ্কায়—উৎকণ্ঠায় সে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তটিনীর চিঠি পাইয়া, রমলা ব্যথিত হইলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। মহিমের জেল হওয়া সংবাদে তাহার সমস্ত অভিমান নিমেষে সমবেদনায় ভিজিয়া গেল। উনিশে মাঘ সকালে মহিম রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। দেশের জন্য সে জেলের কয়েদী হইয়া দিন কাটাইতেছে; আর নিজের স্বার্থ-টুকুর পানে চাহিয়া, রমলা শুধু তাহার প্রতি অবিচার করিয়া বার-বার তাহাকে ধিক্কার দিয়াছে! রমলার মন আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল। তাহার স্মৃতির বেদীতে মহিমের মূর্ত্তি যেন মুহূর্ত্তে সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া

ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া, রমলা মনে মনে শতবার মহিমের পায়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

"বৌদি, দাদা স্নান ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে খেতে দেবে চল।"

লীলার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া রমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। "চল লীলি, আসন-জলটা ঠিক কর-গে তো বোন্।"

দুর্ব্বলতাটুকু সম্পূর্ণরূপে গোপন করিবার জন্য, মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া দিয়া রমলা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গেল।

তারপর আবার সেই দৈনন্দিন গতি; সংসারের কাজে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা, একজনকে ভুলিবার প্রাণপণ প্রয়াস, অন্যকে সাবধানে এড়াইয়া চলা। মনের সঙ্গে দোকানদারি করিতে করিতে যখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সে শুধু নিভৃতে বসিয়া কাঁদে; চোখের জলে আপনার অস্তিত্ব ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিতে চায়। পরক্ষণেই আবার লীলার মায়া নীরবে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া সংসারের পথে টানিয়া আনে।

কোনো দিকেই গত্যন্তর নাই দেখিয়া, রমলা এবার মেনকার মতই নৃশংসভাবে মনের গলাটা চাপিয়া ধরিল; প্রাণের আলো-বাতাসের গতি-পথগুলি জোর করিয়া রুদ্ধ করিল। অন্ধকার মনের কোণে কিরণের পত্নীত্বটুকু অবলম্বন করিয়া রমলা ধীরে ধীরে জীবনের আশ্রয়-গৃহখানি বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল: নিরালা গুহার ভিতর অতি সন্তর্পণে বরফের ঘর বাঁধার মত। এমন সময়, তাহার সকল রুদ্ধ-দ্বার ভাঙিয়া—এক ঝলক প্রখর সূর্য্য-কিরণের মত—আচম্বিতে আসিয়া পড়িল মহিম। রমলার কষ্ট-রচিত মানস-গৃহের-ভিত্তি-প্রাচীর নিমেষে ভূমিসাৎ হইল। তাহার মনের সব শক্তি মুহূর্ত্তে চূরমার হইয়া গেল। কল্পনার সূত্রগুলি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া—বুকের ভিতর আবার সেই প্রবল ঝড় উঠিয়া পড়িল। এবার আর কোনমতেই রমলা নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিতেছিল না। চিত্তবৃত্তিগুলি সব ওলট্-পালট্ খাইয়া তাহার অন্তরে যে ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাতে রমলা আজ বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িল।

"আমি এমন কী গুরুতর অপরাধ ক'রেছিলাম রমলা, যার জন্যে এতবড় শাস্তিটা আমার মাথায় চাপা'লে—তোমরা সবাই মিলে? তোমার মনে মনে যদি—যদি—এই অভিসন্ধি; তোমাদের মতলবটা আমায় তখন খুলে' ব'ল্‌লেই তো পার্‌তে! না-হয়, না-ই হ'ত। আমি কি ভিক্ষে চেয়েছিলাম—তোমাদের দরজায় ভিখারির মতন হাত পেতে—পেতে? ফাঁকি—ফাঁকির দরকারটা কি ছিল—?"

৯২

মহিম এতো অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনো কথা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। মুখ-চোখের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হইতেছিল—সে বুঝি পাগল হইয়া গিয়াছে। বেদনাক্লিষ্ট চোখ দু'টিতে যেন প্রাণের কোনও স্পন্দন নাই; বিবর্ণ মুখখানির ভিতর দিয়া মনের সমস্ত আগুন অতি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এতদিন পরে, নিতান্ত সহসা—মহিমকে দেখিয়া রমলার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কৈশোরের হারাণো সুর নূতন করিয়া কাণে বাজিতেই, পলকে রমলার মুখ-চোখে আনন্দের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পলকেই তাহা নিবিয়া গেল—তাহার সুন্দর সুগৌর মুখখানা ছাই-এর মত মলিন করিয়া।

রমলা মহিমের কথার কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। যাহার জন্য রমলার হৃদয় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, অবরুদ্ধ পলাতক-আসামীর মত আপনাকে আজ জীবনের দরবারে বিচারের কাঠগড়ায় বাঁধিয়া আনিয়াছে, সেই মহিম যে ঝড়ের মত আবার এমনি করিয়া সাম্‌নে আসিয়া পড়িবে, তাহা রমলার ধ্যানের অতীত ছিল।

অভিমান, সঙ্কোচ ও সমাজ, সব-কিছু ডুবাইয়া ক্ষণেকে রমলার প্রাণে জোয়ারের বান ডাকিয়া গেল। তাহার তৃষিত-সত্ত্বা যেন শিবরাত্রির ব্রতশেষে ক্ষুধার্ত্ত দুরন্ত ভিক্ষুকের মত প্রাণের অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; লোলুপ হাত দু'টি বাড়াইয়া বলিল—'ওগো দাও—দাও।'

না, রমলা পারিবে না ; জীবনকে এমনি বঞ্চিত করিয়া সে আর একটী দিনও বাঁচিতে পারিবে না। বঞ্চনার আগুনে নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করার চেয়ে, সারা বিশ্বের লাঞ্ছনার আগুনে নিঃশেষে পূর্ণাহুতি দিয়া, অন্ততঃ জীবনের একটী ক্ষণও সে সার্থক করিয়া লইবে। পথ-চলার কারবারে যেখানে মাইল-পাথরের মত একটীর পর একটী—কেবল লাল-বাতিই জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেখানে স্বপ্নের ঐশ্বর্য্যটুকুই যে তাহার জীবনে অমূল্য সম্পদ।

টলিতে টলিতে রমলার ক্লিষ্ট মন যেন আচম্বিতে কি একটা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়মুষ্টিতে দুর্ব্বলতাগুলি চাপিয়া ধরিয়া, সে সহসা মহিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। উদ্গত অশ্রু সবলে রোধ করিয়া, নির্ম্মম—নিষ্ঠুরভাবে রমলা মহিমকে প্রত্যাখ্যান করিল। যে তৃষিত প্রাণ মহিমের পদ-প্রান্তে পড়িয়া কাঁদিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই উপর 'চকমকি' ঠুকিয়া রমলা মহিমের বুকে সহস্র অগ্নি-কণা ছুঁড়িয়া মারিল—

"খুব হ'য়েছে মহিমদা,······অন্তরের দোহায় দিয়ে কাজ নাই ······ফিরে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহিমের মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল ; অসহ্য যন্ত্রনায় কাতর হইয়া, দুই হাতে বুকের পাঁজরা কয়খানি চাপিয়া ধরিল।

মহিম চলিয়া গেল। যে আগন্তুক বিকার ক্ষণেকের জন্য রমলাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ঘোর কাটিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। রমলার বিদ্রোহী মন আবার কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িল; স্বর্গভ্রষ্ট স্যাটানের মত অতলস্পর্শ অন্ধকারের পথে ছুটিয়া চলিল। সীমাহীন সেই ভীষণ অন্ধকারে নিজেকেও দেখা যায় না; প্রাণ বুকের ভিতর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হইয়া যায়।

মহিমকে রমলা যত বড় আঘাতই করিয়া থাক্, মহিম যে তাহাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে, এ বিশ্বাস রমলার যথেষ্ট ছিল। মহিমের কাছে তাহার নিভৃত অন্তরের কোনো কথা অবিদিত নাই। আর মহিম যদি তাহাকে ক্ষমা না-ই করে, রমলা কৃত-ক্রুটির সকল শাস্তি নীরবে বহন করিবে। কিন্তু বিদায় বেলায়—তাহারই দেওয়া দক্ষিণার তীব্র কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত মহিমের মুখে যে বেদনার্ত্ত ছবি সে দেখিয়াছে, তাহা রমলা কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। এখানে আর নিজেকে ক্ষমা করিবার মত মনের সম্বলও তাহার ছিল না। রমলার সব শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া কূট হলাহলের মত সেই কালো ছায়াটুকু যেন আবার তাহাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিতে লাগিল। মহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে রমলা নিজেকে অনেকখানি আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল; বিচ্ছিন্ন মনের সঙ্গে লড়াই করিয়া, জীবন-যাত্রার গতি কতকটা ফিরাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু তাহার সব পরিশ্রম আবার মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হইয়া গেল।

একটা সপ্তাহ যে কি ভাবে কাটিল, তাহা রমলা নিজেও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার চিন্তার প্রখরতা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, মন ততই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। কিরণ বাড়ীতে না থাকিলে রমলা অনেকখানি সোয়াস্তি অনুভব করিত; কিরণের সংস্পর্শ সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু এবার রমলার মনের গতি এমন পথে চলিল—যেখানে সে শুধু কিরণকেই মুহুর্মুহুঃ পাইতে চায়। কিরণ কাছে আসিলে, তাহার মনের সমস্ত জড়তা নিমেষে কাটিয়া যায়; আত্মরক্ষার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠে। কিরণ যেন রমলার জীবন-পথে মূর্ত্তিমান অন্ধকার। যতক্ষণ সে থাকে, রমলার পথের ক্ষীণ প্রদীপ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়।

লীলাকে পড়ানো ও সেলাই শিখানো বিষয়েও এই কয়দিন রমলা অত্যন্ত ঢিল দিয়াছে। কোন কাজেই সে মন বসাইতে পারে না; সর্ব্বদাই যেন কিসের দুশ্চিন্তায় বিমনা হইয়া থাকে। বালিকা লীলার চোখেও তাহার এই আকস্মিক অন্যমনস্কতাটুকু গোপন রহিল না। তবে লীলা এখনো মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝিবার মত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই, তাই রমলা নিষ্কৃতি পায়; কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাহাকে মক্‌স' করিতে হয় না। কিন্তু লীলার আনন্দ-মুখর কৈশোর মাঝে মাঝে যেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রখর দৃষ্টিতে বৌদির বুকের ভিতরটা দেখিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হয়; তাহার আনন্দের বিশ্রাম-কুঞ্জখানি ম্রিয়মান দেখিয়া, সে হঠাৎ এক একবার ব্যথিত হইয়া উঠে; আপন-মনে কি ভাবে, কিসের সন্ধান করে।

বৌদির কোলের কাছে বসিয়া, তাহার ব্লাউসের বোতাম খুঁটিতে খুঁটিতে হঠাৎ ভারি গলায় লীলা বলিয়া ফেলে—"বৌদি, তোমার বুঝি মায়ের জন্যে মন-কেমন ক'রছে!"

আচম্বিতে রমলা একটু চমকিয়া উঠে। লীলার মাথাটি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে তাহার চুলে বিলি কাটে। দীর্ঘশ্বাস চাপিতে গিয়া কথা বলা হয় না।

"তা হ'লে মহিমদার সঙ্গে গেলে না কেন? তাঁকে তখন-তখনি ফিরিয়ে দিলে!"

নিস্তব্ধ দুপুরের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মতই জানালা-দরজাগুলি আলোড়িত করিয়া বৈশাখের গরম বাতাস সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি-স্পর্শ দিয়া যায়। ঝলাসের ঝাপটায় সুরকি-বাঁধানো পথের লাল ধূলা-বালি উড়িয়া আসে। রমলা উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখে—

পথে লোক চলাচল কমিয়া গিয়াছে। গঙ্গার ওপারে বালুচর আর বিস্তীর্ণ ময়দানের উপর প্রচণ্ড রৌদ্রে যেন রাবণের ঝিল জ্বলিতেছে। সম্মুখে প্রাচীন বটগাছটার জটার ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি বাদুড় ঝুলিতেছে, গভীর প্রতীক্ষায়—নিস্তব্ধ মৃত্যুর এক একটী মৌনী দূতের মত।

গলাটা আরো একটু লম্বা করিয়া রমলা প্রসারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্বপ্নময় সুন্দর দুইটী চোখে অতল ব্যাকুলতা; একান্ত উদ্‌গ্রীবভাবে কিসের সন্ধানে পথের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

মাটি তাতিয়া আগুন হইয়াছে। রাখালেরা গরুগুলিকে বাগানে

বাথান দিয়া গাছের ডালে বসিয়া আপন-মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। রুদ্র বৈশাখের সেই দ্বিপ্রহরে, মরুময় জীবনে অতীত প্রেমের স্মৃতির মতই মিষ্ট ও করুণ সে সুর। স্তব্ধ দুপুরে আজ বাঁশীর কম্পমান আওয়াজটুকু যেন রমলার প্রাণের প্রত্যেকটী তন্ত্রী চঞ্চল গতিতে স্পর্শ করিতেছিল। তাহার মন ধীরে ধীরে আবার অতীতের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, অন্ধকার অন্তরের পথে স্মৃতির এক একটী সূত্র ধরিয়া।

সহসা কাহার পদশব্দে রমলা আঁৎকাইয়া উঠিল। মনে হইল, 'কে যেন সম্মুখের রাস্তা দিয়া দ্রুত-পদে কোথায় চলিয়াছে!'

বিহ্বলভাবে জানালার উপর ঝুঁকিয়া রমলা বিস্ফারিত চোখে চাহিল—'মাথায় ছাতি নাই; খদ্দরের চাদরখানা কপালের উপর দিয়া উল্টানো; শুষ্ক, বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ; চোখের কোণে জল⋯' রমলার বুকের ভিতরটা হিম-সিম হইয়া উঠিল। তাহার পাঁজ্‌রা কয়খানিকে মোচড় দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল— "ম—মহিম-দা⋯"

"—বৌদি!⋯" রমলার মুখ দেখিয়া লীলার বোধহয় হঠাৎ একটু ভয় হইয়াছিল।

"অ্যাঁ, লিলি—!" ডাক শুনিয়া অনেকখানি সজাগ হইলেও, কণ্ঠস্বরে মানসিক বিকৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুটিয়া উঠিল।

"তুমি কাঁদ্‌ছো বৌদি?"

"না"—; একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, লীলার মুখখানি রমলা নিবিড়ভাবে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

বৈশাখের শেষ, ১৩৩৬

নিতান্ত অকাজে পূরা একটী মাস কলিকাতায় কাটাইয়া, কিরণ বাড়ী ফিরিল। রুক্ষ চেহারা, চোখের কোলে কালিমা, সর্ব্বাঙ্গে অবসাদের ছায়া; দেখিলে মনে হয়—যেন এই এক মাসেই সে পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছে। তীর্থ-সঙ্গী পাণ্ডার মত এবার কিরণের সঙ্গে আসিয়াছেন কলিকাতার একটী বন্ধু—'উল্লাস রায়'। পাতলা, ফর্শা, চোখে শেলের চশমা, গোঁফ্-দাড়ি কামানো, সাবানে-সাবানে তামাটে-ধরা লম্বা লম্বা চুল; বয়স বোধহয় সাতাশের বেশী হইবে না, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি জীবনের পরিমিত জমার অঙ্ক নিঃশেষে ব্যয় করিয়া বসিয়াছেন। চশমার পুরু কাঁচ যেমন চল্লিশের প্রয়োজন ছাড়াইয়া অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, কপালেও বোধহয় সেইরূপ পঞ্চাশ-ঊর্দ্ধের দুই চারিটী রেখা প্রবল হইয়া আত্ম-বিস্তার করিয়াছে।

এই উল্লাসবাবুকে রমলার প্রথম হইতেই যেন কেমন-কেমন লাগিল; এমন কি, লীলারও। এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করিয়া লইবার হেতু রমলার মনে জাগিত না। কিন্তু তিনি যখন আতিথ্য গ্রহণের পর আধ ঘণ্টা না কাটিতেই, ঢিলা পায়জামা পরিয়া স্যাণ্ডাল ফট্ ফট্ করিতে করিতে একেবারে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া হাজির হইলেন, এবং সিস্ দিতে দিতে তাহার পিঠের কাছে আসিয়া অতি ঘনিষ্ঠের মত বলিলেন—"কি হ'চ্চে বোউ-দি! ...কারী?"

রমলার বুকের ভিতর নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিল ; আতঙ্কে জড়-সড় হইয়া লীলার পাশ ঘেঁসিয়া বসিল।

এসেন্সের গন্ধ ছাপাইয়া, উল্লাসবাবুর মুখ হইতে এক ঝলক উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইল।

রমলাকে নীরব দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে তিনি প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিলেন—"হ্যালো কিরণ-দা, বৌদি যে শ্রেফ্ অমিত্রাক্ষর হ'য়ে যাচ্ছেন।"

কিরণ তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিল। উল্লাসের কথা শুনিয়া মাঝের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া গম্ভীরভাবে লীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"লিলি, ব'লে দে, যেন উল্লাসের কোনো অসম্মান না হয়।"

রমলার মনে বেশ একটু খোঁচা লাগিল। একথা এমনভাবে তাহাকে জানানোর কী দরকার ছিল ? ভদ্র অতিথির সম্মান ভিন্ন অসম্মান হইবার মত এমন কী ব্যবহার সে করিতে পারে, যাহার জন্য কিরণ পূর্ব্বাহ্ণেই এতখানি সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার বুঝিলেন ?

কোনো উত্তর না দিয়া, রমলা নীচু মুখে বসিয়া উনানে জ্বালানি ঠেলিয়া দিতে লাগিল। বোধহয় কিরণের কথাটা সে তখনো হজম করিতে পারে নাই।

উল্লাসবাবু এবার আরো একটু রসিকতার সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"ব্রেভো ! নার্সিসাসের রোগ ধ'রেছে দেখ্‌ছি আপনার। আগুনের আভায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল নিজের অঙ্গই যে একচিত্তে দেখ্‌ছেন। Indeed charming ! Bloody Kiran's fortune, I grudge.

রমলা বিরক্ত হইয়া, কাজের অছিলায় উঠিয়া ভাঁড়ার ঘরে গেল। কিন্তু উল্লাসের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া তত সহজ নহে। নির্লজ্জের মত হাসিতে হাসিতে সেও রমলার পিছু পিছু ভাঁড়ারে গিয়া হাজির হইল। তাহার ঢং দেখিয়া রমলার আপাদ-মস্তক বিষ-বিষ করিতে লাগিল।

উল্লাসের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে রমলার বিলম্ব হইল না। তাহার কথা-বার্ত্তা ও চাল-চলনের মধ্যে যে লোলুপতা রমলা লক্ষ্য করিল, তাহাতে ভিতরে ভিতরে তাহাকে অনেকখানি সাবধান হইতে হইল। লীলাকেও সে সর্ব্বপ্রযত্নে উল্লাসের সংস্পর্শ হইতে দূরে টানিয়া রাখে।

এতবড় বিপ্লবের পর মহিম সহজে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে রিক্ততার আবর্ত্তে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই; তবুও মনকে নোঙ্গর করিতে হয়; নইলে চলে না। চারিদিকে অতল দুশ্চিতার ভিতর যখন উন্মত্ত বাতাসের দোলা লাগে, তখন মন পথ হারাইয়া ফেলে; তাই প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে বাঁধিবার জন্য একটা সম্বল খুঁজিয়া বেড়ায়।

কলিকাতায় ফিরিয়াও আপনাকে শান্ত করিবার মত কোনো অবলম্বন মহিম খুঁজিয়া পাইল না। সে যেন দারুণ 'ভিসাস্ সার্কেলে'র মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকের পাক খুলিতে আর একদিক জড়াইয়া আসে; একটী গ্রন্থি খুলিতে অন্যটী আঁটিয়া বসে।

রুটিন্ বাঁধা পেট্রল-পুলিশের মত ফুটপাথে ঘুরিয়া আর ক'দিন আনমনা থাকা যায়? অথচ, মেসের আবহাওয়া, বই, বন্ধু-বান্ধব— সব যেন এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ ভোরে উঠিয়া মহিম যে মেস্ হইতে বাহির হইয়া যায়, সে খবর দারোয়ান্ ছাড়া আর কেহই জানে না। দুপুরে কোন কোনদিন না খাইয়াই কাটে। রাত্রে যখন মহিম বাসায় আসে, তখন এক 'ধূপ চৌধুরী' বোধহয় জাগিয়া থাকে। তাই সে-ই জোর করিয়া রাত্রে খাওয়ায়। মহিমের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বেশী প্রশ্ন করিতে ধূপেরও সাহস হয় না। তবু মাঝে মাঝে মহিমের মুখ-চোখ দেখিয়া, সে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারে না: "তুই কি শেষে পাগল হ'য়ে যাবি নাকি?"

শুষ্ক একটু হাসিয়া মহিম উত্তর দেয়—"হ'লে বাঁচা যেত'।"—চোখ দুইটী যেন হঠাৎ আরো কি-রকম হইয়া পড়ে।

ধূপ অনেক চেষ্টা করিয়াও মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারে না। নিতান্ত যে উত্তরটুকু না দিলে নয়, মহিম তাহার বেশী কোন কথাই বলে না।

মহিমকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টায়, ধূপ এক একদিন তাহার নূতন-লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া বসে; পড়িয়া শুনাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেকক্ষণ বকিয়া যাওয়ার পর, যখন হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া দেখে, বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না যে, মহিম উপন্যাসের গল্প হইতে কতদূরে সরিয়া আপনার মধ্যে চুপ-চাপ হইয়া গিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ হইতে ফিরিয়া মহিম বাড়ীতেও আর কোন চিঠি-পত্র লেখে নাই। লেটারবক্সে অনেক চিঠি আসিয়া জমা হইয়াছে; সেগুলিও খুলিয়া পড়িবার অবসর হয় নাই।

আগেই ধূপ নোটিস্ দিয়া রাখিয়াছিল—রবিবারে মহিমকে নিশ্চয় সিনেমায় যাইতে হইবে। নোটিসের কথা মহিমের স্মরণ না থাকিলেও, ধূপ ভুলে নাই; তাই ভোরেই সে মহিমকে আট্‌কাইয়া ফেলিয়াছে। একবার বাহির হইলে, সুযোগ মত ফিরিবার দায়িত্বে মহিমকে আর এখন কোনরকমেই বিশ্বাস করা যায় না।

সারাটা দিন কয়েদীর মত ঘরে আবদ্ধ থাকা, মহিমের সব চেয়ে বড় শাস্তি। উড়ন-চণ্ডীর ঝাপ্‌টায় পথে পথে ঘুরিয়া মরায়

আনন্দ না থাকিলেও, ঘরের কোণে কর্ম্মহীন বসিয়া থাকার অস্বস্তি হইতে সে নিষ্কৃতি পায়। অনিবার্য্য মনের গতিকে সে পায়ের গতিতে প্রতিক্ষণ ছাপাইয়া চলিবার জন্যই যেন মিছেমিছি ঘুরিয়া মরে। অকাজের চাপে ছোট-খাটো কাজের তাড়াগুলিকে পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ছাড়ে।

সকাল হইতে ন'টা পর্য্যন্ত পর-পর কয়েক কাপ চা ধ্বংস করিয়া, যখন তাহাতেও বিরক্তি ধরিয়া গেল, হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে মহিম চীৎকার করিয়া মেসের চাকরটাকে বলিল—"গোষ্ঠা, আমার আইনের বইগুলো কলেজ ষ্ট্রিটে বিক্রি ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারিস্‌, পুরোণো বইয়ালাদের কাছে? যা টাকা দেয়, তুই নিস্‌।"

হুকুমের তাৎপর্য্য না পাইয়া, বেচারী গোষ্ঠচন্দ্র হঠাৎ থতমত খাইয়া বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কথাটা খোলসা জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও তাহার হইল না।

তাহাকে হাবা-গঙ্গারামের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মহিম বিরক্তির সঙ্গে আবার বলিয়া উঠিল—"যা—না বোকাকান্ত, ওগুলো নিয়ে যা, যে চুলোয় পারিস্‌। আমার সুমুখ থেকে সরা এখুনি।"

গোষ্ঠ ভয়ে-ভয়ে শেল্‌ফের উপর হইতে বইগুলি টানিয়া নামাইতে লাগিল। বাবুর খেয়ালটার ঠিক মানে সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মহিম আপন-মনেই আবার বলিয়া উঠিল—"যা,—যা. আপদ-গুলো সব বিদেয় ক'রে আয়।"

বইগুলি বগলে করিয়া গোষ্ঠ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কথার মাথা-মুণ্ড সব না বুঝিলেও, টাকা কয়টি যে বাবু তাহাকেই লইতে বলিলেন, এবং সে কথাটুকুর মধ্যে যে কোনো গোলমাল নাই, তাহা গোষ্ঠ বুঝিয়াছিল।

গোষ্ঠ বাহির হইয়া যাইতেই, মহিম আবার ডাকিল—"আমার চিঠির বাক্সটা খুলে নিয়ে আয় তো।"

কয়দিনে যে সব চিঠি আসিয়া জমিয়াছে, মহিম একে একে খুলিয়া দেখিতে লাগিল। সরকার মশায়ের, তটিনীর, গোমস্তার—আরো অনেকের। এষ্টেটের আমলাদের সেই একঘেয়ে ঘ্যান্-ঘ্যানানি; আয়, ব্যয় আর তছ্রুপের কথা—না পড়িয়াই মহিম এক পাশে সরাইয়া রাখিল। তটিনীর চিঠি কয়খানি বাছিয়া লইতে—চোখ পড়িল আর একখানি লেপাফার উপর। ঠিক রমলার মত হাতের লেখা! অবিকল তেমনি ছাঁদ—কিন্তু, অসম্ভব। মহিমের বুকের ভিতর যেন কেমন ধ্বস্ ধ্বস্ করিয়া উঠিল।

ক্ষণেক কি ভাবিয়া মহিম খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। চিঠি রমলারই। মাত্র কয়েকটা কথা; কিন্তু, কেন? তবুও মুহূর্ত্তে মহিমের শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

......"দিদির চিঠিতে জান্'লাম—তুমি রাজমহলে ফের নি। তাই কোলকাতার ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি।...জানি, ক্ষমা চাইবার মুখ রাখি নি; তবু এ কথাও জানি যে, জগতে শুধু তোমার কাছেই, না-চাইতে ক্ষমা পাবো। আমার অবস্থাটা একবার

আগা-গোড়া ভেবে দেখো। আর যে-ই যা করুক, অন্ততঃ তুমি আমায় ভুল বুঝো না।"—রমলা।

বিমূঢ়ভাবে বসিয়া মহিম একদৃষ্টে পত্রের ওই কয়েকটী কথার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে তখন ক্ষমা ও ক্ষোভের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পাওয়া না-পাওয়া ও দেওয়া না-দেওয়ার সমস্যা—সবই যেন নাগার্জ্জুনের শূন্যবাদের মত তাহার মনকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। মন তাহা মানিয়া লইবার আগেই প্রশ্নোত্তর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

মহিম সেই ছোট্ট চিঠিখানিই যে কতবার পড়িল, তাহার হিসাব নাই। কি জানি, কিসের ব্যথায় তাহার চোখের পাতা দুইটি বার-বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ক্ষমা—রমলা?

নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—পুনশ্চ "চিঠির উত্তর দিও না।" প্রত্যেকটী অক্ষর আঁকা-বাঁকা; যেন প্রতি ক্ষেপে কলম কাঁপিয়া গিয়াছে; অসংলগ্ন নয়টী বক্ররেখা। এর অর্থ শব্দে নয়, লিখনে নয়; ঐ বক্রতাই বুঝি মনের ভাষা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবার মহিম আর চোখের জল আট্‌কাইতে পারিল না। এতোদিন শুধু উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাহার বক্ষতল শুকাইয়া গিয়াছিল। আজ তাহা যেন স্নানের জন্যই পাগল হইয়াছে।

চার্লির বই মহিমের ভালো লাগে না। কিন্তু ধূপকে সে কথা কে বুঝায়? ধূপ জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে; জোর

করিয়াই আগা-গোড়া দেখাইবে। মহিম অনেকবার বলিয়াছে; ধূপ ঠাট্টা করিয়া তাহাকে উদ্বাস্ত করিয়াছে। 'তালুলা' আর 'তালমাজের' চোখ দেখিয়া তাহার কবে নেশা লাগিয়াছিল, সেই কথা লইয়া সে আজো মহিমকে বিদ্রূপে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে ছাড়ে না। অগত্যা মহিম চুপচাপ আসিয়া বসিল।

সমস্ত প্রেক্ষাগার যখন ছবিতে মস্‌গুল, মহিম হঠাৎ ধূপের ঘাড়ে হাত দিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"resurrection দেখেছো ধূপ ?"

ধূপ অবাক্ হইয়া মহিমের মুখপানে চাহিল। অন্ধকারে তাহার চোখ-মুখ ভালো দেখা গেল না, কিন্তু চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল।

একটু খোঁচা দিয়া ধূপ বলিল—"সাইবেরিয়াকে রাঁচিতে বদ্‌লি ক'রে, তোর resurrection এবার নতুন ক'রে দেখ্‌বো।" ......দাঁতে দাঁত চাপিয়া আবার বলিল—"হতভাগা যেন দিন দিন 'চড়ক গাছ' হ'য়ে উঠ্‌ছে।"

ছবি দেখুক আর না-ই দেখুক, মহিম চুপচাপ বসিয়া ছিল, হয় তো নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়াই; কখন ইন্‌টারভ্যাল হইয়াছে, তাহাও বোধহয় জানে না। আচম্‌কা পিছন হইতে একখানি গন্ধ মাখানো রুমালে তাহার চোখ দুইটি বাঁধিয়া কে হাসিয়া বলিল—"হ্যালো truant !"

সমর এতো কাছে বসিয়া, অথচ সে তাহাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই; মহিম একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল—"তুই ?"

পিছনের 'রো'তে বসিয়া সমর—আরও দুইটি মেয়ে। সিল্কের সরু পাইনাপ্লি-পরা লম্বা মেয়েটীকে সে যেন খুব চেনে, তবু ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল না। আন্‌মনে আঁচলে চশমা মুছিতেছেন, পাখার হাওয়ায় শাড়িখানি তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতেছে, যেন অপরাজেয় রূপের সঙ্গে প্রাণপণে প্রতিযোগিতা করিতে চায়।

মহিম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার সমরের মুখপানে চাহিল। সমর বোধহয় তাহার চোখের প্রশ্ন বুঝিয়াই একটু দোল-দেওয়া সুরে বলিল—"পরিচয় ?…'ইলা-বলি'। আর উনি—মিস্ সেন ; বিনয়ের বোন্। বিনয়কে মনে আছে তো ?"

'ইলা-বলি ! ধ্যেৎ, সমরটা আজীবন সেই হেঁয়ালিই বুনে চ'লেছে।' তবু প্রকাশ্যে মহিম আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সমর বেশ আনন্দের সঙ্গেই মাদ্রী সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—"ইনিই আমাদের মহিমবাবু, যাঁর কথা আপনারা আমার মুখে সব সময়ই শোনেন। শিল্পী, কবি, ভাবুক, কর্ম্মী ও স্কলার —একাধারে সবই ; তবে ইদানীং একটু বেশী সেন্‌টিমেণ্টাল হ'য়ে উঠেছেন।"

মিস্ সেন বিশেষ সম্ভ্রান্ততার সহিত মহিমকে একটী ছোট্ট নমস্কার জানাইলেন। মহিমের কথা তিনি সত্যই অনেক শুনিয়াছেন, তবে সমরের চেয়ে সুনন্দার মুখেই বেশী।

সমরের কথা শেষ হইবার আগেই সুনন্দার চশমা মোছা যেন হঠাৎ আপনা-আপনি অর্দ্ধপথে শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুনন্দা মুখ তুলিয়া যখন দেখিল—মহিম তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

নির্ব্বিকার, এমন কি, তাহার চোখের দৃষ্টিটুকু পর্য্যন্ত, তখন বোধহয় সুনন্দাকে আবার বাধ্য হইয়াই অন্যমনস্ক হইতে হইল।

অবহেলা যদি না-ও হয়; এতোখানি উদাসীনতা সুনন্দাকে কম আঘাত করিল না। এক বৎসরের মধ্যে মানুষ কেমন করিয়া এতো বদলাইতে পারে? না, ইচ্ছা করিয়াই মহিম তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়! তবু মহিমের কাছে সে অন্ততঃ একটু মৌখিক সম্বর্দ্ধনাও আশা করে; ভাষার একান্ত দৈন্য হইলেও, একটু প্রীতি-দৃষ্টি।

ঘনিষ্ঠ কেন, যে কোন পরিচিতকেই সুনন্দা এ ত্রুটির জন্য ক্ষমা করিতে পারে না। কিন্তু পলকমাত্র দৃষ্টিতে সে মহিমের মুখ-চোখে যে অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনটুকু দেখিয়াছে, তাহাতে অভিমানের ছায়া তাহার মনে ঠিক রেখাপাত করিতে পারিল না। হয় তো একটু ক্ষুণ্ণ হওয়া ব্যতীত, মহিমের বিরুদ্ধে আর কোন শাস্তিই তাহার অন্তর বিধান করিতে পারে না।...... মহিমকে ঠিক অনুরূপ আঘাত করিবে কি না, ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই আলো নিবিয়া গেল।

সুনন্দার অবস্থাটা সমরের চোখ এড়ায় নাই। মহিমের এই উদাসীনতা যে সুনন্দাকে সত্যই খুব আঘাত করিবে, তাহা সে জানে। অথচ মহিমের সঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে বেলুড়ে যখন তাহার দেখা হয়, তখনই সমর বুঝিয়াছিল—মহিমের ভিতর কি ভীষণ একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। অবশ্য সে চেষ্টা করিয়াও তাহার কারণ জানিতে পারে নাই।

সুনন্দার পিঠে হাত দিয়া সমর সমবেদনা জানাইয়া বলিল—

"নন্দি, অবনীবাবু মারা যাওয়ার পর মহিমের মনের অবস্থাটা কেমন পাগলের মত হ'য়ে গেছে, দেখেছিস্? সে মানুষই যেন নাই।

বোধহয় নিজেকে সংযত করার জন্যই অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সুনন্দা বলিল—"অবনীবাবু কে, দাদা?"

"মহিমের দাদা।......বেচারার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া ভুল—নন্দি। ওর চাউনি পর্য্যন্ত এতো vacant হ'য়ে উঠেছে যে, দেখে ভয় হয়।"

সিনেমা ভাঙার পর সুনন্দা নিজেই মহিমের সঙ্গে আলাপ করিল। লজ্জায় মহিমের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। কিন্তু সুনন্দা প্রসঙ্গটি ঘুরাইয়া, মহিমকে সকালে চা খাইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়া বিদায় লইল।

সারা রাত্রি মহিমের ভালো ঘুম হইল না। অসংলগ্ন স্বপ্নের টুক্‌রার মত কতকগুলি দুশ্চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। দুপুরের আগে পর্য্যন্ত তাহার মনে যে বেদুইনের নেশা প্রবল হইয়াই নাচিতেছিল, রমলার চিঠি পাওয়ার পর হইতে তাহা যেন আস্তে আস্তে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে। আবার ঝিমাইয়া পড়া তৃষ্ণার্ত্ত মনে আবার 'লু'র ঝাপ্‌টা লাগিয়া, তুমুল তোলপাড় বাধিয়া উঠিয়াছে।......আগাগোড়া এমনি; জীবনটা কি তাহার মনের সঙ্গে সারা জীবন কেবল বস্মঘট করিয়াই

চলিবে ?…আত্মহত্যা সে করিতে পারে ; কিন্তু মনের কাছে জীবনের অত বড় পরাজয় সে অতি বড় কারণেও সহ্য করিতে পারে না।

বেশী বেলা পর্য্যন্ত মহিম ইচ্ছা করিয়াই বিছানায় পড়িয়া রহিল। ঘুম তাহার চোখে ছিল না ; কিন্তু বাহিরের জগতকে, অক্লান্ত জনস্রোতের ক্ষুধায় চঞ্চল কলিকাতার রাজপথকে আর সে বার-বার মনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিবার অবসর দিবে না। অবসর নয়, প্রশ্রয় ; শুধু প্রশ্রয় দিয়াই সে নিজেকে পথের দেয়াসীন করিয়া তুলিয়াছে।……কিন্তু কতক্ষণ ভালো লাগে ? এমনি অকর্ম্মণ্যের মত সে বেশীক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না।

"গোষ্ঠা,……গোষ্ঠা, দুটো চুরোট নিয়ে আয়তো।" মহিম উঠিয়া বসিল। চুরোট সে খায় না, কিন্তু আজ খাইবে। কিছু ভালো লাগে না ; জীবন যেখানে এত নিঃসঙ্গ, সে সব-ই খাইবে।

—"বাবু, চা আন্‌তে হবে না ?"

"নাঃ, চা নয়। এক গ্লাস সরবৎ আন্‌বি।…আচ্ছা থাক্, কিছুই আন্‌তে হবে না। বিছানাটা ঝেড়ে বেড-কভার দিয়ে দে। কাপড়গুলো নিয়ে যা ; তুই, মথুর ঠাকুর আর কুমুদ—তিন জনে নিবি। ঘরটা বন্ধ ক'রে চাবি ধূপের কাছে দিবি। আর আমি কয়দিন খাবো না ; ব'লে দিস্।"

বিছানা হইতে উঠিয়াই মহিম জামা-কাপড় বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গোষ্ঠ দ্বিতীয়বার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। অনুমান করিল—বাবু কয়েকদিনের জন্য

বোধহয় দেশে যাইবেন। তাহার হাতে খুচরা-খরচের যে টাকা দিয়াছিল, মহিম তাহার হিসাবও চাহিল না, ফেরৎও চাহিল না।

রাস্তায় নামিতেই মহিম চমকিয়া দেখিল—সমর আর সুনন্দা। বোধহয় তাহার উদ্দেশেই আসিতেছে।

মহিমের হাতে একটা চাপ দিয়া সমর ভৎর্সনার স্বরে বলিল—"বাঃ, দূর থেকে আমাদের দেখেই বুঝি পালাবার চেষ্টা ক'রছিলি ?"

মহিম অনেকখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল ;—"না, না, আমার সে কথা মনে,—আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম সমর।"

"ভুলে যে আপনি যাবেন, তা আমি জান্'তাম্। তবু আটটা পর্য্যন্ত আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রেছি। শেষ, আমাদেরও আজ সকালে চা খাওয়া হয় নি।"

সুনন্দার কথায় অভিযোগের ছাঁদ, কিন্তু উত্তাপ নাই। কোনো কৈফিয়ৎ মহিমের মুখে যোগাইল না। একবার মাত্র সুনন্দার মুখপানে বিব্রতভাবে চাহিল। সুনন্দা আজ সকালেই স্নান করিয়াছে। পরণের চুণারি শাড়ি প্রভাত-রৌদ্রে যেন ঝল্ মল্ করিতেছিল।

সমর একরকম জোর করিয়াই মহিমকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

ভাল না লাগিলেও, উপায়ান্তর নাই। রমলা কোনদিনের জন্যও মুখ-ফুটিয়া কোন বিরক্তি প্রকাশ করিল না। কিরণের ভয়ে নয়, নিজের কর্ত্তব্যের খাতিরে সে উল্লাসবাবুর আদর-যত্ন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। অতিথির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কিরণকে নূতন করিয়া কোনো কথা বলিবার সুযোগ সে দিল না। তবে কিরণের সহস্র তাগিদ সত্ত্বেও রমলা উল্লাসের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলা-মেশা করিতে পারিল না। বিশেষ, উল্লাসবাবুর কথাবার্ত্তার মধ্যে সে মাঝে মাঝে যে শ্রেণীর ইয়ারকির গন্ধ পাইত, তাহাতেই রমলার মন যেন আরো বিগড়াইয়া উঠিত।

কিন্তু কিরণ প্রায়ই খোঁচা দিতে ছাড়িত না। রমলা বুঝিত তাহার ভিতর উল্লাসের চেষ্টা আছে। উল্লাসের সঙ্গে মিশিয়া কিরণের নিজের ভাবও যেন অনেকখানি বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর রমলা চার মাস ধরিয়া কিরণকে যাহা দেখিয়াছিল, এবার হঠাৎ এক মাস পরে দেখিল—সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কলিকাতা হইতে কিরণ যেন আর এক মানুষ হইয়া ফিরিয়াছে। এ কতকটা সেই কিরণ, যাহার কথা রমলা বিবাহের পূর্ব্বে দুই একবার শুনিয়াছিল। অথচ বিবাহের পর ঐ অল্প কয়েক মাসে রমলার মন বহুবার দোল খাইয়াছে; কিরণের শিষ্ট ব্যবহারে রমলা বার-বার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছে; চঞ্চল হইয়া ভাবিয়াছে —কেমন করিয়া কিরণকে তাহার নিজস্ব অধিকার হইতে সে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে। সে যেন প্রতিদিন কিরণের কাছে ঋণী হইয়া পড়িতেছিল।

উল্লাসের সঙ্গে জুটিয়া কিরণের আজ যে কদর্য্যতা একে একে বাহির হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে রমলার প্রশ্ন আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। রমলা ভাবিতেও পারে নাই যে কিরণের ভিতর এত গ্লানি লুকানো ছিল, শুধু সুযোগ ও সুবিধার অভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, কিম্বা কিরণ ইচ্ছা করিয়াই রমলাকে জয় করিবার জন্য একটা মুখোষ পরিয়াছিল। প্রত্যেকটী দিন— কিরণের সম্বন্ধে যত কথা তাহার কাণে আসিতে লাগিল, তাহাতে রমলা শুধু এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া বুঝিল যে, সমস্ত সমাজ-নীতির সঙ্গে ভিতরে ভিতরে যুদ্ধ করিয়া সে যদি নিজেকে অমনভাবে দূরে সরাইয়া না রাখিত, তাহা হইলে আজ সে কিরণের পিছনের পথে উচ্ছিষ্ট মাটির ভাঁড়ের মতই গড়াগড়ি যাইত। উৎসবের আশা তো তাহার ভবিষ্য জীবনে কোনদিন ছিলই না, অতীত গৌরবটুকু স্মরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্বলও তাহার নিঃশেষে মুছিয়া যাইত। শুধু অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ভস্মস্তূপ তাহার জীবনকে আরো কালিমাময় করিয়া তুলিত।

দিন চলা নয়, একটীর পর একটী করিয়া রমলার দিন কাটিতেছিল, সশঙ্কিত মনে সংসারের কাজের আড়ালে আড়ালে। রমলার সঙ্গে কিরণ বরাবর যে ব্যবধানটুকু রাখিয়া চলিত, সেটুকু যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কিরণ এতো অগ্রসর হইয়া পড়ে যে, রমলার বুকের ভিতরটা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আসে। তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রমলার সংজ্ঞা ঝিমাইয়া পড়িতে চায়। সে আরো বেশী ভয় পায়—কিরণের মুখে উল্লাসের ভাষা শুনিয়া; এমন কি, উল্লাসের সুরের ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত।

লীলা যখন থাকে না, রমলা কাজকর্ম্ম লইয়া একাই ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইদানীং উল্লাসের ব্যবহারে রমলার মনে এমন একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিয়াছে যে, লীলাকে সে এক মুহূর্ত্তও সঙ্গছাড়া করিতে সাহস পায় না। রমলার মনে আরো ধাঁধা লাগে : কিরণ তো উল্লাসকে না জানা নয়! কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে এতোখানি অধিকার দেওয়ার মানে কি? রমলা অনেকবার ভাবিয়াছে—কিরণকে বলিবে ; কিন্তু পারে না। কিরণের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়া না হোক্, অন্ততঃ অপরিচিতা ভদ্রমহিলা হিসাবে তাহার সহিত উল্লাসের যেটুকু ব্যবধান রাখিয়া চলা উচিত, সেটুকু রক্ষা করার জন্যও কি কিরণবাবুর কোনো দায়িত্ব নাই?

জীবন যেখানে যৌবনের প্রখর রৌদ্রে ফেনিল তাড়ির মত মাতিয়া উঠে, বিবেচনার অবসর সেখানে তলানির মতই অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। কিরণের মনের যাহা কিছু স্নিগ্ধ সঞ্চয়—তীব্র মাদকতায় তাহা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। রমলার কথা কেন, নিজের কথা ভাবিবার অবকাশও তাহার ছিল না।

উল্লাসবাবু আসিয়া কিরণ ও তারা-হালদারের দলে তৃতীয় পাকা ঘুঁটির মত ত্র্যহস্পর্শ যোগ বাধাইয়া তুলিলেন। কিরণ আগে আগে যাহা করিত, তাহাতে অন্ততঃ সঙ্কোচের একটা আবরণ ছিল। নেশা-ভাঙ করিলেও প্রকাশ্য মাতাল সে ছিল না। তাহার চরিত্রের কলঙ্ক শুধু পরিচিত মহলেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; পথে-ঘাটে এমন প্রচারিত হইয়া পড়ে নাই। 'অঞ্জনের' অভিসন্ধিতে উল্লাস রায় নিছক 'ত্রিপুণ্ড্রেশ্বর' মামা হইয়া দাঁড়াইলেন, আর আখ্ড়াওয়ালা বাবাজী হইয়া উঠিল তারা-হালদার।

তখন তুলসী-বিহার। গ্রাম-দেশ হইতে দলে দলে যাত্রী আসিয়া জমিয়াছে রঘুনাথগঞ্জের ঘাটে,—স্নান-পুণ্যের আশায়। এমনি হাজার হাজার পল্লীবাসীর মেলা, অনাড়ম্বর গ্রাম্যবধূ ও কিশোরীর দল, উল্লাস তাহার জীবনে আজ প্রথম দেখিল। তাই, হয় তো বা তাহারই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া, তাহাদের সবুজ সজ্যে মধু-মহোৎসবের আয়োজন চলিতে লাগিল। কিরণের মন নূতন ইন্ধন পাইয়া আবার অদম্য বেগেই ঝড় তুলিবার উপক্রম করিতে লাগিল। বিবাহের পর, এই কয়মাস তাহার মন যে-জড়তায় কুণ্ডলী পাকাইয়া গিয়াছিল, উল্লাসের সংস্পর্শে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বেশ সতেজ হইয়া উঠিল।

নিতান্ত নিঃসঙ্গ একটী মেয়ে, পটের ছবির মতই অকুণ্ঠ সৌন্দর্য্য তার, কেমন করিয়া যেন সঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়াছে ; সারামুখে ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি।······কিরণ আর উল্লাস এতক্ষণ বালি-ঘাটের চরে দাঁড়াইয়া 'আল্‌কাটাকাপ' শুনিতেছিল। সহসা চোখ ফিরাইতেই কিরণের দৃষ্টি পড়িল সেই দিকে। এক লহমায় কিরণ আগা-গোড়া বুঝিয়া লইল। উল্লাসের ঘাড়ে মৃদু চাপ দিয়া, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—"ফলো করিস্। বিরাজকে দেখি।"

মাত্র দুই এক কথায় বোঝা-পড়া শেষ করিয়া কিরণ দ্রুতপদে চলিল বিরাজের উদ্দেশে।

এই বিরাজ ছিল তারা-হালদারের বাড়ীর ঝি ; কিরণের বড়াই-দূতি। বয়স তাহার প্রৌঢ়ত্ব ছাড়াইয়া বার্দ্ধক্যে নামিলেও, রুচি আজো যৌবনের ব্যবসা লইয়াই মত্ত ছিল। বিরাজকে অনেকেই চিনিত, কিন্তু তাহার মুখের ভয়ে—তাহাকে মুখরা বলিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত কাহারো ছিল না। কালো, মোটা চেহারা ; বয়সের ভারে দেহ শ্লথ হইয়া আসিয়াছিল ; তবুও বিরাজমোহিনীর নৈপুণ্য কমে নাই। তাহার অসাধ্য কাজ যে জগতে খুব কমই ছিল, তাহা কিরণ বহুবার প্রমাণ লইয়া জানিয়াছে। তাই এবারও সে বিরাজের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত হইল।

সারাটা দিন দারুণ ব্যস্ততায় কাটিল। আজ আর কিরণ খাইবার জন্যও বাড়ী গেল না ; শুধু বিকালে একবার লীলাকে বলিয়া আসিল—রমলা ও সে যেন সন্ধ্যার পর পিসিমার বাড়ী যায় ; বিশেষ দরকারে তিনি ডাকিয়াছেন।

অন্যবারের মত বিরাজ এবারও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিল। সঙ্গীহীনা তরুনীর আত্মীয়া সাজিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে তাহাকে বেণু সরকারের প'ড়ো বাড়ীতে আনিয়া হাজির করিল। সেই নিষ্কলঙ্ক পল্লী-বালার সজল চোখ দেখিয়া বিরাজের মন দমিল না।

এত বড় প'ড়ো বাড়ীটার ভিতর পা বাড়াইতেই জয়ার গা কেমন ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে বলিল—"মাসিমা, এ কার বাড়ীতে—"

নিঃসঙ্কোচে কপালে করাঘাত করিয়া বিরাজ বুঝাইল—এ তাহারই বাড়ী ; ত্রিভুবনে তাহার আর কেহই নাই, তাই বাড়ীর আজ এই দশা। জয়াদের কোনো খোঁজ-খবর এতদিন সে পায় নাই, নহিলে বাড়ীকে সে আবার রাজ-বাড়ীর মতই করিয়া তুলিত।

জয়ার বুকের ভিতরটা যেন তবুও শুকাইয়া উঠিতেছিল। জোরে বিরাজের আঁচল চাপিয়া ধরিয়া আবার ডাকিল—"মা-সি-মা।"

"কি বাছা, হদ্দমদ্দ জ্যান্ত মানুষটা আমি যখন সঙ্গে রয়েছি, তখন বাড়ী ঢুকতে তোমার অত তরাস্ কিসের? কথাতেই বলে—ভিন্নু ভাতে বাপ-পড়শী ; তাই আমাকেও পর ভাবছো, কেমন ?"

বিরাজ তাহার গোল গোল চোখ দু'টি তুলিয়া জয়ার মুখপানে একবার চাহিল।

জয়া একটা ঢোক গিলিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল—"কৈ, আমার শাশুড়ীকে খুঁজ্‌তে গেলে না ?"

"যাবো, যাবো। সারাটা দিন ঘুরে মর্‌ছি, একটু ছাই ব'স্‌তেও কি দেবে না বাপু।" বলিতে বলিতে বিরাজ বিরক্তির সঙ্গে বসিয়া পড়িল।

জয়া ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ডটা পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে নানা আশঙ্কা তোলপাড় করিতে থাকিলেও, বিরাজের আশ্রয় ভিন্ন তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, জয়ার চোখে অনাগতের আতঙ্ক যেন ততই গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

প্রয়োজন মত দুই একখানি ঘর ব্যবহার উপযোগী করিয়া রাখিতে বিরাজ ভুলে নাই। যে দুইখানি ঘরে বেণু সরকারের যাত্রার মহলা হইত, বিরাজ সেই দু'খানি ঘর পরিষ্কার করিয়া আগেই বিছানা ও জিনিষ-পত্রে সাজাইয়া গিয়াছে। বিধবার বাসগৃহ প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট সরঞ্জামই বিরাজ আমদানি করিয়াছিল।

এক পাশে একখানি শতরঞ্চিতে জয়াকে বসাইয়া বিরাজ সস্নেহ-ভঙ্গীতে জলখাবারের থালা ধরিয়া দিল। কিন্তু জয়ার মন তখন ক্রমেই ধৈর্য্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। বার-বার অনুরোধে ক্ষেত্র অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারে, ভাবিয়া—বিরাজ গম্ভীরভাবে বলিল—"কি জ্বালাতনেই প'ড়েছি বাছা! গোড়াতেই বুঝেছিলাম—তুমি আমাকে পর-পর ভাব্‌ছো। তা যাক্‌, খাবে তো খাও, না হয় ব'সো একটুখানি। সাঁঝ লেগেছে, বাতি

ধরিয়ে ঠাকুর পেন্নামটা ক'রে নিই। তার পর যেখানে ব'ল্‌বে, সেইখানেই নিয়ে যাবো—তোমার সেই পোড়ারমুখী শাশুড়ীকে খুঁজতে।"......

আপন-মনে গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে বিরাজ চৌকাঠে জল দিয়া সন্ধ্যা জাগাইতে বসিল। ভীত, সন্ত্রস্ত মনে জয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। মাসিমা হইলেও, বিরাজকে পীড়াপীড়ি করিবার সাহস জয়া সঞ্চয় করিতে পারিল না।

বিরাজের সন্ধ্যা-বন্দনা সহজে শেষ হইবার নয়। জয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল।

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া জয়া আরো কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিল। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার মত মনের শক্তি তাহার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। বিরাজের ব্যবহারে প্রথম যত কোমলতা জয়া দেখিয়াছিল, এখন তার প্রত্যেকটী তাহার মনে সন্দেহের ছায়াপাত করিতে লাগিল। বিরাজের চোখে যেন বিজাতীয় তীব্রতা। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বিরাজ তাহার শাশুড়ীর খোঁজের জন্য নিজেই অধিক ব্যাকুলতা দেখাইতেছিল, এখন সে-ই আবার শাশুড়ীর খোঁজ লইবার কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার পর হইতে বিরাজ হাজারগুণ বেশী গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে তো আর কোনো জন-মনুষ্য আসে না! আপনার বলিতে কেহই না থাকিলে, এই নির্জ্জন দৈত্যপুরীতে মাসিমা একা কেমন করিয়া বাস করে? হয় তো এটা প'ড়ো বাড়ীই। বাড়ীতে একটা কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত নাই! তবে?

এইবার জয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল : "মাসিমা, আমি এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমার শাশুড়ীর কাছে আমাকে দিয়ে আস্‌বে চলো।"

অর্দ্ধ-প্রণত অবস্থায় বিরাজ একবার মুখ ফিরাইয়া চাহিল; চোখে একবিন্দুও মমতা নাই। ঈষৎ হাসি—বিষাক্ত ছুরির মত।

আরো ভয় পাইয়া জয়া প্রায় চীৎকার করিয়াই কাঁদিয়া উঠিল —"না, আমি এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না।"

"চুপ। এই রাত্তিরকালে কোন্ মরিচ-বনে যাবি, যা।"—ধমক্ দিয়া বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর, পাথরের মত শক্ত চেহারা।

জয়া চমকিয়া উঠিল। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারা সব চুপি-চুপি পরামর্শ করিতেছে।

তারা-হালদার, কিরণ আর উল্লাস; পিছনে বেণু সরকার। বিরাজের মুখে বিরক্তি ও প্রসন্নতার এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য।

রমলা ও লীলা যখন পিসিমার বাড়ী হইতে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। কিরণরা তখনো বাড়ী ফিরে নাই। যশোদা দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। রমলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে হুকাটী লুকাইল।—যশোদানন্দন বাড়ীর চাকর। রমলার তাই খুব স্নেহের পাত্র। সংসারে আপনার বলিতে যশোদার কেহই ছিল না। বুদ্ধিমান না হইলেও, অতি সরল ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসী বলিয়া সে অল্পদিনের মধ্যেই রমলার স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল।

যশোদার মুখপানে চাহিয়া লীলা একটু কৌতুকের সঙ্গে

বলিয়া উঠিল—"দেখ্‌ছ বৌদি, খিদেয় বেচারা একদম হেঁজে উঠেছে। আমি তখনি তোমাকে ব'লেছিলাম—বাড়ী চল।"

"তাই নাকি রে? সত্যি খুব খিদে পেয়েছে তোর? হতভাগা, ও-বাড়ী গিয়ে ডাক্‌লেই পার্‌তিস্। আয়—" রমলা অগ্রসর হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল।

যশোদা সে-কথার কোন উত্তরও দিল না, এক পা নড়িলও না।

সন্ধ্যার প্রদীপটি ঘরের কোণে তখনো জ্বলিতেছিল। রমলা হঠাৎ ঘরের মধ্যে পা বাড়াইয়াই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িল। মেঝেয় তাহার জামা-কাপড়গুলি এলোমেলোভাবে পড়িয়া; বাক্স খোলা; ঘরময় কাগজের টুক্‌রা ছড়ানো।

ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইতে রমলার বিলম্ব হইল না; সন্দেহ মিটাইবার জন্য ডাকিল—"যশোদা! এ দিকে আয় তো।"

যশোদা ভয়ে ভয়ে আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। কথা বলিবার শক্তি বোধহয় তখন তাহার ছিল না। রমলা তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিলেও, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব কে ক'রেছে, জানিস্?"

যশোদাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, রমলা ধমক্ দিয়া বলিল—"বল্ হতভাগা, কে ক'রেছে?"

"—বাবু—"

'বাবু!'—অনুমান করিলেও, কথাটা শুনিয়া রমলার মাথার মধ্যে জ্বালা করিয়া উঠিল। 'বাবু!—কিরণবাবু ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যিনি তাহার জীবনে আরাধ্যতমের স্থান অধিকার

করিয়াছেন, তিনিই? কিন্তু কি প্রয়োজনে? রমলার বাক্সটা খানাতল্লাস করাই যদি তাঁহার দরকার হইয়াছিল, তিনি প্রকাশ্যে সে কথা রমলাকে জানাইলেই পারিতেন। কিম্বা রমলার প্রতি যদি তাঁহার কোন জঘন্য সন্দেহই হইয়া থাকে, তিনি রমলাকে দূর করিয়া দিলেই তো পারিতেন।'

অবসন্নভাবে রমলা মেঝেয় বসিয়া পড়িল। তাহার মন এতো বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বিশৃঙ্খল জিনিবগুলি হাত দিয়া ছুঁইবার প্রবৃত্তিও হইল না। লীলা চৌকাঠ ধরিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া ছিল। দাদার ব্যবহারে তাহার মনটা লজ্জায় পিষিয়া যাইতেছিল। রমলার কাছে আসিয়া বসিবার মত শক্তিও বোধহয় লীলার মন হইতে লোপ পাইয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জীবনের আগাগোড়া ভাবিয়া, এ লাঞ্ছনাটুকু সহ্য করিয়া লইতে রমলার বেশীক্ষণ লাগিল না। জীবনের যে কঠোরতম পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার তুলনায় আর কী নূতনতর লাঞ্ছনা তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে? লাঞ্ছনাই যেখানে স্বাভাবিক প্রাপ্য, সেখানে অলাঞ্ছনার অবসরেই বরং তাহার মন শ্লথ হইতে চায়।

রমলা ধীরে ধীরে কাপড়-জামাগুলি গুছাইয়া বাক্সে তুলিতে লাগিল। বাক্সে তাহার যে কয়খানি গহনা ছিল, মাত্র সেই কয়খানি গহনা ব্যতীত আর কিছুই বোধহয় কিরণের দরকার ছিল না; কিন্তু মহিমের ছবিখানির উপর কিরণের অত বড় আক্রোশ হইবার কারণ কি? কারণ থাকা হয় তো অসম্ভব ছিল না, যদি কিরণ জানিয়া শুনিয়া রমলাকে বিবাহ না করিত।

না—না, তা নয়, মানি তা নয়। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তির মাঝখানে অভিনয়ের কি কোনো ঠাঁই আছে,—বিন্দুমাত্র? কিরণ যেন গাত্রদাহেই মহিমের ছবিখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

লীলা একটু সরিয়া যাইতেই, যশোদা এক নিঃশ্বাসে রমলার কাছে বলিয়া ফেলিল—উল্লাস, তারা-হালদার, বাবু, বিরাজ-মোহিনী আর সেই প'ড়ো বাড়ীর কথা; আরো যে-সব ঘটনা সে জানিয়াছে। জয়া—যাত্রীদের একটী বউ……।

মুহূর্ত্তে রমলা নিজের কথা ভুলিয়া গেল। তাহার বাক্স গুছানো হইল না। উৎপীড়িতের মত ব্যথিত সুরে রমলা বলিল—"যশো, তুই চিনিস্ সে বাড়ী? নিয়ে যেতে পার্‌বি আমায় সেখানে? চল্—এক্ষুণি চল্ যশো।"

লীলাকে বাড়ীতে রাখিয়া রমলা প্রায় পাগলের মত যশোদার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উঃ, এই কিরণ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তাহার স্বামী! ঘৃণায় রমলার আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিতেছিল।

জেলেপাড়ার এক প্রান্তে মস্ত ভাঙা বাড়ী। পল্লী প্রায় নিশুতি হইয়া পড়িয়াছে। কেবল দুই একটী বাড়ীতে তখনো কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, আর দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে পচুই মদের গন্ধ ও অবসন্ন কোলাহলের শব্দ আসিতেছিল।

বাহিরের দরজা ভাঙা; কপাট নাই। পুরাণো ইট আর চুণ-বালি জমিয়া পথ প্রায় অগম্য হইয়া উঠিলেও, রমলার গতি

বাধা পাইল না। দ্রুতপদে উঠান অতিক্রম করিয়া রমলা দর-দালানে গিয়া দাঁড়াইল।......সম্মুখে বিরাজ—দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঘাঁটি আগ্‌লাইতেছে।

অতি বড় প্রখরা হইলেও, রমলাকে দেখিয়া বিরাজ ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল।

রমলা গম্ভীরভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল—"চলো, কোন ঘর—দেখিয়ে দেবে।"

কথাটি মাত্র না বলিয়া বিরাজ আগে আগে চলিল। এই বিরাজের কাছে পুলিসের চোখ-রাঙানিও বহুবার হার মানিয়াছে।

কিন্তু তাহার অন্তরের উগ্র-পিশাচী ওঝার মন্ত্র-আজ্ঞার মত রমলার ওই কয়েকটী কথা অবনত মস্তকে না মানিয়া পারিল না।

কিরণ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে সহসা রমলা ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। রমলাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কিরণ যেন হতবাক্ হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই প্রায় দস্যুর মত তর্জ্জন করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল "তুমি এখানে?"

"হাঁ আমি—" রমলা একবিন্দুও ভয় পাইল না; নির্ভীকভাবে মুখ তুলিয়া বলিল—"কিন্তু আপনারা—! ছিঃ—" রাগে দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

কিরণ আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"চলে' যাও এখান থেকে। যাও—ব'ল্‌ছি।"

"না। আপনারা এমনি ক'রে, এতো বড় সর্ব্বনাশ— একজন···" রমলার কথা শেষ না হইতেই কিরণ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া বলিল—"আমার বাড়ীতে ব'সে যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌বে, আবার আমারই উপর এতো অত্যাচার! সর্ব্বনাশ? মহিমকে নিয়ে তুমি আমারই বাড়ী ব'সে—।" কিরণ তখন ভালমন্দ জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে। রমলাকে জোরে ঠেলা দিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কিরণের ধাক্কা সহ্য করিতে না পারিয়া, রমলা দরদালানে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আঘাতের অনুভূতি পর্য্যন্ত তখন তাহার লুপ্ত হইয়াছিল।

যশোদার চোখে জল আসিল। রমলা তাহাকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "ভয় নাই যশো, চলো।"

গ্লানির দারুণ আবর্ত্তে রমলার সারা মন কর্দ্দমাক্ত হইতেছিল। এই কিরণ তাহার স্বামী! এই কিরণের জন্যই সে মহিমের আদর্শ-জীবনকে বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে। অপমানিত, লাঞ্ছিত করিয়া সে মহিমকে অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী হইতে বিদায় করিয়াছে। আর কিরণ আজ তাহার স্বেচ্ছাচারের—উচ্ছৃঙ্খলতার কালি নির্ব্বিচারে রমলার উপর ঢালিয়া দিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করিল না। মহিমের সঙ্গে তাহাকে না জড়াইয়া আজ জগতের যে কোন কলঙ্ক দিলেও বোধহয় রমলার প্রাণে এতবড় আঘাত লাগিত না।······তবুও অশেষ ধৈর্য্যের সহিত নিজেকে সংযত করিয়া রমলা বাড়ী ফিরিল।

লীলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রমলা তখনি একখানা চিঠি

লিখিয়া যশোদার হাতে দিল। কিরণ তাহার যত পূজ্যই হউক্, কিরণের এই অমানুষিক ব্যভিচার সে প্রাণ থাকিতে সহ্য করিবে না; পারিবে না।

যশোদাকে থানায় পাঠাইয়া রমলা মর্ম্মন্তুদ বেদনায় লুটাইয়া পড়িল। আজ তাহার চোখে একবিন্দুও জল ছিল না। জীবনের সমস্ত দুঃখ ও বেদনায় যেন একসঙ্গে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। রমলার বুকে কিরণের যে পাষাণ-বিগ্রহ জোর করিয়া আসন পাতিয়াছিল, আজ কিরণ যেন নিজ হাতেই যে বিগ্রহের গায়ে চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

সারা রাত্রি রমলার চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত সুখ-দুঃখ—এমন কি, নিজের জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করিয়া সে যাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছে; তাহারই নামে এত বড় কলঙ্ক যখন সে বুক পাতিয়া লইল, তখন মাথা পাতিয়াই বা লইবে না কেন?

অনেকবার কাটিয়া ছিঁড়িয়া রমলা মহিমকে লিখিল—"মহিমদা, তোমায় যত অপমান ক'রেছি, সব ক্ষমা ক'রো। জানি তুমি ক্ষমা ক'রেছ, তবু আবার জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি। আমার ভুলের পূর্ণাহুতি হ'য়েছে। মৃত্যুর চেয়ে আর কোনো সত্যকেই আমি বড় ব'লে মান্‌বো না। আমার বাবার শেষ ইচ্ছা,—না, না, আমি আর ভুলেও তার অপমান ক'রতে পারবো না। বিশ্বাস ক'রবার শক্তি যদি সত্যি তোমার মনে না থাকে, তাতেও আমার দুঃখ নাই। তবু তোমার কাছে

আমার শেষ আশ্রয়ের জন্য ভিক্ষা চাচ্ছি। এ নরক থেকে আমায় তুলে' নাও দেবতা। একটী দিনও দেরী ক'রো না; তা হ'লে হয় তো মরণের কোলেই আমায় আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো।"—রমলা।

পরদিন সকালে: চিঠিখানি ডাকে দিবার জন্য যশোদার হাতে দিয়া রমলা স্নানের ঘরে গেল। এই একটা রাত্রে যেন তাহার জীবনের আকেন্দ্র-পরিধি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে চৌচীর হইয়া গিয়াছে। অবসাদে রমলার পা ফেলিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের উপর দিয়া অনেক ঝড় গিয়াছে, কিন্তু এত বড় বিপ্লব আর কোনদিনও রমলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আজিকার নূতন আলো তাহার জীবনে আর এক নূতন রহস্যের হেঁয়ালি বুনিয়া যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

বন্ধুত্বের বিনিময়ে কিরণের নিকট অকথ্য অপমান ও অপবাদ পাইলেও, মহিম তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিল না। কিরণের অপরাধ নিষ্কৃতি পাইবার মত নয়; তবু মহিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে কিরণের শাস্তি অনেক লঘু হইল: দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

কিরণ যতদিন জেলে থাকে, ততদিন লীলাকে লইয়া রাজমহলে থাকিবার জন্য মহিম রমলাকে অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু রমলা রাজী হইল না। অথচ রঘুনাথগঞ্জে দ্বিতীয় অভিভাবক নাই। আছে শুধু চারিদিকে কিরণের পাওনাদার, আর সংসারের দারুণ অসচ্ছলতা। অন্য সময় হইলে হয় তো মহিম রমলাকে রঘুনাথগঞ্জ হইতে যে কোন জায়গায় কিছুদিনের মত সরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, কিন্তু এখন আর তাহা পারিল না। তবে রমলার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া, কিরণের ছোট-খাটো দেনাগুলি মহিম নিজেই মিটাইয়া ফেলিল। এবং রমলার অসম্মতি সত্ত্বেও, গোমস্তার নিকট মাসে মাসে প্রয়োজন মত টাকা লইবার ভার সে একরকম জোর করিয়াই লীলার ঘাড়ে চাপাইয়া গেল।......মহিম বুঝিতেছিল রমলার কুণ্ঠা কোথায়; কিন্তু রমলাকে সে কোনরূপেই আমল দিল না।

রমলা জীবনের সব লাঞ্ছনাই একে একে সহ্য করিয়া চলিতেছিল। সে সহিষ্ণুতায় আর কিছু না থাক্, অন্ততঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত মনের জোরটুকু তাহার বাঁচিয়া ছিল। পলে পলে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া চলিবার আনন্দটুকু হইতে

রমলা একদিনের জন্যও বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু আজ মহিম যখন শুধু তাহারই মুখ চাহিয়া নিজের সমস্ত সত্তাকে মুহূর্ত্তে সেই চলার-পথে মুঠি মুঠি করিয়া ছড়াইয়া দিল, রমলার বুকে দীর্ঘশ্বাসটী পর্য্যন্ত পিছাইয়া গেল। নিজেকে নিঃস্ব করার আনন্দ যেন কর্পূরের মত বাতাসে উপিয়া গিয়াছিল।

অতি অকারণ মহিম হঠাৎ জাপান চলিয়া গেল; হয় তো বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্যই। রমলার ইচ্ছা হইয়াছিল—তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চায়; লীলার ভার তাহাকে দিয়া, জীবনের জ্বালাময় অগ্নিশিখাগুলি কেরোসিনের আগুনে মিশাইয়া দেয়। কিন্তু পারিল না। মহিম সে সুযোগ রমলাকে একটী ক্ষণের জন্যও দিল না।

তারপর আবার সেই দিন চলা। সংসারের অবলম্বন এখন শুধু লীলা আর যশোদা। মাঝে মাঝে কৃতকর্ম্মের জন্য গৌরবও রমলার মনকে স্পর্শ করে, ঈষৎ বেদনাও দোলা দেয়।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কিরণ জেল হইতে ফিরিয়াছে। দেহে সে শক্তি নাই; মনের সে উগ্রতা নাই। দৃষ্টিতে অপরাধের সঙ্কোচ।

কিরণ ফিরিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রমলার বুকের ভিতর একটা অমানুষিক অত্যাচারের ভয় ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কিরণের সহিত সে যাহা করিয়াছে, মহত্ত্বের দিক দিয়া তাহার আদর্শ যত বড়ই হোক্ না, কিরণ যে তাহাকে সে জন্য কঠোরতম শাস্তি দিবে, তাহা রমলা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিল। কিন্তু কিরণ যখন সত্যই ফিরিল, রমলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার মুখপানে চাহিয়া। এই দুই বৎসরে যেন কিরণের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; সম্পূর্ণ আর এক মানুষ।

কিরণ কথা প্রসঙ্গেও কোনদিন রমলার নিকট পূর্ব্বকথা উত্থাপন করিল না। রমলা প্রথম দু'একদিন তাহাতে একটু চিন্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কিরণের মনে অভিমানের উত্তাপ বিন্দুমাত্র নাই; কথাবার্ত্তায় অতীতের সংস্রব পর্য্যন্ত নাই।

পূর্ব্বে শুধু কিরণের জন্য রমলা নিজেকে অমনভাবে বাঁচাইয়া চলিবার সুযোগ পাইয়াছিল; কিন্তু এবার? কিরণের ব্যবহারে রমলার মন মাঝে মাঝে বেশ একটু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

স্বাস্থ্যের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল,

ডাক্তারও কিরণকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাইতে যাইবার স্পৃহা তাহার ছিল না।

মহিমের প্রতি কিরণের মনে যে বিদ্বেষ ছিল, তার সবটুকু যেন এই কিছুদিনের ভিতর অঞ্জলি-ভরা শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইবার সময় কিরণের প্রাণে ফেনায়মান আনন্দের মত ভাসিয়া উঠিয়াছিল শুধু মহিমকে বুকে জড়াইয়া বার-বার ক্ষমা চাহিবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কিরণ যখন বাড়ী ফিরিয়া শুনিল—মহিম তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার মন দুঃখ ও অনুশোচনার ভারে ভাঙিয়া পড়িল।

মহিমের মহত্ত্ব তাহাকে যতখানি ঋণী করিয়াছে, তাহাই কিরণ কখনো শোধ করিতে পারিবে না; তার উপর আবার তাহারই অর্থে এলাহাবাদ গিয়া শরীর সারিতে কিরণ যথেষ্ট সঙ্কোচ অনুভব করিল। শ্রাবণের শেষেই রঘুনাথগঞ্জের বাড়ী বিক্রয় করিয়া সে বাকী দেনাগুলি নিঃশেষে পরিশোধ করিয়া দিল। রঘুনাথগঞ্জের স্মৃতি জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য কিরণের প্রাণ যেন বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

সব চেয়ে বড় গ্লানি, অধঃপতনের চূড়ান্ত ইতিহাস এই রঘুনাথগঞ্জেই লেখা হইয়াছে; তাই সে-পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য কিরণ আগে রঘুনাথগঞ্জের সংস্রব ত্যাগ করিতেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

প্রাচীন গৌড়ের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানি গ্রাম ; একদিকে মহানন্দা, আর একদিকে পবিত্র-তোয়া গঙ্গা। এই বিজয়নগরেই নাকি বাঙলার বিজয়ী রাজা তাঁহার জয়-পতাকা প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

প্রায় পনেরো বৎসর পূর্ব্বে কিরণ বিজয়নগর ছাড়িয়া গিয়াছিল ; আর কখনো ফিরিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। কিন্তু আজ আবার সেই বিজয়নগরেই তাহাকে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল বলিয়া, মনে এক কণাও ক্ষোভ নাই ; বিজয়নগরের মাটিতে পা দিয়া বরং তাহার সারা প্রাণ আনন্দে দুলিয়া উঠিল। এই পবিত্র মাটিতে নামিয়া সে পৃথিবীর আলো, বাতাস আর আকাশকে একদিন প্রথম অভিনন্দন জানাইয়াছে ; আজ আবার সেই বিজয়নগরের মাটিতেই মাথা নোয়াইয়া কিরণ পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানাইবে। কিংবা আবার নূতন করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবে ; বিজয়নগরের আলো-বাতাসে জীবনের অভিষেক করিয়া পুনরায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রতিদিন কিরণের ব্যবহারে যেন রমলার জীবনে নূতনতর অধ্যায়ের সূচনা হইতেছিল। ব্যবধান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া চলিলেও, রমলা সর্ব্বান্তঃকরণে কিরণের সেবা করিয়া যাইতেছিল। কিরণের শরীর অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল রমলার অক্লান্ত শুশ্রূষায়। কিরণও রমলার হাতে নিজেকে

নিঃশেষে তুলিয়া দিয়াছে। অথচ মাঝখানে একটা বিরাট ব্যবধান —অদৃশ্য লোহ-অর্গল দু'জনের অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

সংসারের অধিকাংশ কাজ লীলাই করে। রমলা থাকে কিরণের তত্ত্বাবধান লইয়া, তাহারই পাশে পাশে। এই অবিচ্ছিন্ন পাশাপাশি পথ-চলায় প্রথমে উভয়েরই যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু তাহা হঠাৎ ভাঙিয়া ফেলিল কিরণ। নিভৃতে রমলাকে পাইয়া কিরণ একদিন সহসা তাহার হাতখানি সসঙ্কোচে ধরিয়া ফেলিল। রমলা অনেকখানি পিছাইয়া যাইত, কিন্তু কিরণের চোখে তখন যে কাতর দৃষ্টিটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে রমলা একপাও নড়িতে পারিল না।

তেমনি দৃষ্টিতে রমলার মুখপানে চাহিয়া কিরণ অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় কি তুমি ক্ষমা ক'র্‌তে পেরেছ' রমলা?"

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কোনো উত্তর সহসা রমলার মুখে যোগাইল না। নতমুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমলাকে নীরব দেখিয়া কিরণ আপন-মনেই বলিল—"জানি, ক্ষমা তুমি কোনদিন ক'র্‌তে পার্‌বে না। তোমার জীবনটাকে আমি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছি।......" একটা কম্পমান দীর্ঘশ্বাস যেন কিরণের কাতর দৃষ্টির সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

রমলা কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে যে এমন কঠোর পরীক্ষায় কোনদিন পড়িবে, তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

"তুমি কুণ্ঠিত হ'য়ো না রমলা। আমি এমনি কতকগুলো

কথা জান্‌বো ব'লে তোমায় জিগ্‌গেস্ ক'র্‌ছি। মনে আমার কোনো……"

"বলুন"—এবার রমলা জোর করিয়া নিজের জড়তাটুকু কাটাইয়া কিরণের আরো কাছে সরিয়া বসিল।

"বিয়ে আমাদের সত্যি হয় নি রমল্। তুমি যে শূন্য-দৃষ্টিতে শুধু যজ্ঞের পানে চেয়েই ছিলে, মন্ত্র একটীও বল নি, তা আমি জানি। আর আমি তার জন্যে দাবীও কোনদিন ক'র্‌বো না। ……কিন্তু,—আমায় একটী কথা সত্যি ব'ল্‌বে রমলা ?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া যেন কিরণ অতিশয় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

কিরণের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, রমলা বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল—"একটী কেন, মিথ্যে আমি কোনদিনই বলি নি, ব'ল্‌বোও না। আপনি কি জান্‌তে চান্, বলুন। আমি তার সত্যি উত্তরই দেবো।"

কিন্তু কিরণের সঙ্কোচ কাটিল না। তাই সে অপ্রতিভের মতই বাধা দিয়া বলিল—"না—না থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যা হ'য়ে গেছে…"

"কাজ নাই নয় ; খুব বেশী কাজই বোধহয় আছে ; অন্ততঃ আমার দিক্ দিয়ে। সারা জীবন আমি অত বড় প্রবঞ্চনার বোঝা নিয়ে চ'ল্‌তে পার্‌বো না।"

রমলার কথায় কিরণ সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। হাঁ—না, কিছুই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু রমলা তেমনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া চলিল—

"যা জান্‌তে চাওয়া খুব স্বাভাবিক, আপনি তা-ই জান্‌তে চান্। বিয়ের আগে আমি কা'কেও ভালবেসেছিলাম কিনা? নিজের দিক্ থেকে জীবনকে অত খেলো করি নি কোনদিন, ক'রতাম ব'লেও মনে ভাব্‌বেন না। কিন্তু বাবা ম'র্‌বার সময় যাঁর হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলেন, তাঁকে ছাড়া আর কা'কেও যে কখনো স্বামী ব'লে ভাব্‌তে হবে—সে কথা কল্পনাও ক'র্‌তে পারি নি। তাই—"

কিরণের দিকে দৃষ্টি পড়িতে রমলা থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখের রঙ পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের ছায়া নাই—ম্লানিমা নাই।

রমলা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল—"কিন্তু মহিমদার চরিত্র দুর্ব্বল নয়। আর চরিত্রের মর্য্যাদাও তিনি রাখ্‌তে জানেন।"

"খুব জানি।" কিরণ নির্নিমেষে রমলার মুখপানে চাহিয়া রহিল। রমলার এই নির্ভীক সত্যবাদিতা কিরণকে একটুও চঞ্চল করিল না। তাহার প্রাণমন এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে শুধু এই কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিরণের মনে জাগিতে লাগিল—রমলার জীবনে কতবড় ব্যর্থতা সে আনিয়া দিয়াছে!

বহুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক্ রহিল। তারপর কিরণ সহসা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা রমল্, মৃত্যুর চেয়েও কি অগ্নিকে তুমি বড় সত্য ব'লে মানো?"

ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া রমলা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"কি জানি।"

"কি জানি—নয় রমল্, তা-ই। কিন্তু আগে যদি সে কথা আমায় জানাতে, তা হ'লে এতবড় ভুলটা বোধহয় হ'তে পারতো না; যদিও তখনকার আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ ছিলাম।…" কথা বলিতে বলিতে কিরণ আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। দু'জনেই যেন একটা অকল্পিত অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া বর্ত্তমান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে। গঙ্গার বুকে জেলে-ডিঙ্গির ছপ্ ছপ্ শব্দ ক্রমেই মুখর হইয়া উঠিতেছিল। ষ্টীমার-ঘাটে বিশেষ ভিড় নাই; মাত্র কয়েকটী যাত্রী ফেরির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া। বহুদূরে ষ্টীমারের বাঁশী গভীর জলস্রোতে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

অনেকক্ষণ পর মৌনতা ভঙ্গ করিয়া কিরণ বলিয়া উঠিল—"রমল্, তোমার জীবনটাকে আর আমি জেনে-শুনে' ব্যর্থতায় ভ'রে দেবো না। মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য আমি কিছুই মানি না। প্রতিশ্রুতি! আগুন আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী ক'রে তোমায় আমিই গ্রহণ ক'রেছিলাম—নিতান্ত এক তরফ হ'তে। কিন্তু সে অধিকারে মিথ্যা আড়ম্বর ছাড়া এক ফোঁটাও সত্য ছিল না।… আজকেও এই পবিত্রতম তীর্থ—গঙ্গা, আর আমার অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে সাক্ষী ক'রে বলছি: শপথ ক'রে তোমার উপর যে অধিকার পেয়েছিলাম—মন নয়, শুধু দেহের উপর, সে অধিকার আবার শপথ ক'রেই ত্যাগ ক'রলাম। বাইরের সে অধিকারের কোনও মূল্য নাই রমল্। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি স্বচ্ছন্দে মহিমকে……"

"না—না, আমি তা পার্‌বো না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি এইখানেই······" রমলার মনটা যেন কিরণের কথায় হঠাৎ ওলট-পালট হইয়া গেল।

বাধা দিয়া কিরণ বেশ শান্ত-কণ্ঠে বলিল—"তুমি ভেবো না যে আমার মনে কোনও কষ্ট রইল। আমি আজ খুব আনন্দ পাবো। আর তুমি যদি এইখানেই থাক্‌তে চাও, সারা জীবন নিঃসঙ্কোচে তোমার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকো; তা'তে কোনোদিন তোমায় বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ ক'র্‌তে হবে না।"

কিরণের পায়ের কাছে আভূমি নত হইয়া রমলা অতি উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করুন; আপনাকে শুধু প্রবঞ্চনাই ক'রেছি। তার বদলে এত বড় দান আমি মাথা পেতে নিতে পার্‌বো না;—সে শক্তি আমার নাই।"

গঙ্গার বুকে ধীরে ধীরে প্রদোষের কালো ছায়া নামিতেছিল; ঘরে ঘরে সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

আশ্বিন, ১৩৩৮

কিরণ আর রমলা পাশাপাশি বাস করিতেছিল ঠিক জল আর মাটির মতই। স্থিতিটুকু ঘোলা করিয়া তুলিবার শক্তি দু'জনেরই আছে, অথচ তাহারা পরস্পরকে যথাসাধ্য বাঁচাইয়া চলে। রমলা যতটুকু চাহিয়াছিল, কিরণ ঠিক ততটুকুই নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিয়াছে। আর কিরণের দিক্ হইতে তাহার নিকট যতখানি প্রাপ্য রমলাও সম্ভবমত সেটুকু পরিপূর্ণভাবেই দিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে কিরণের মনে যে দুর্ব্বলতা আসে না, তাহা নহে। কিন্তু কিরণ এখন আনন্দের সঙ্গেই নিজেকে জয় করিতে পারে; পথের চাঞ্চল্য আর এখন তাহার অন্তরে দাগ কাটিতে পারে না।

ঠিক এমনি সময়, এক সকালে কিরণের অপরিসীম আনন্দ জাগাইয়া উপস্থিত হইল মহিম। মাথায় মস্ত মস্ত রুক্ষ চুল; নাকটি মুখের অনুপাতে যেন অতিশয় ধারালো হইয়া উঠিয়াছে; পরণে শাদা খদ্দর; চোখের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য-রকমের তীক্ষ্ণতা। মহিমের সঙ্গে দেখা হওয়া কিরণের কল্পনাতীত ছিল। মনের সমস্ত দৈন্য কিরণ একে একে মুছিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু মহিমের কাছে ক্ষমা চাহিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্য সে তাহাতেও শান্তি পায় নাই। আজ হঠাৎ মহিমকে পাইয়া কিরণ কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল; তাহারই কুটীরে মহিম! কিন্তু সে স্তব্ধতা পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল অপার আনন্দে; মহিমকে

নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কিরণ বলিয়া উঠিল—"মহিম, মহিম, তুই ?"

"হাঁ, বিশেষ দরকারে একবার আস্‌তে হ'ল।" কোনো চাঞ্চল্যের আভাস নাই ; হিমালয়ের মত প্রশান্ত ও অটল।

রমলার সব অনুভূতি অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছিল। নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া শুধু মাথাটি একবার সে নোয়াইল মাত্র। তাহার সারা মন তখন আনন্দে না সঙ্কোচে লুটোপুটি খাইতেছিল, তাহা রমলা নিজেও বুঝিতে পারিল না।

তবে অবস্থাটা তরল হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। লীলা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মহিমের পদধূলি লইয়া কতকটা শাসনের সুরে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা মানুষ যা হোক্। সেই আস্‌ছি ব'লে জাপান পালালে ; পূরো ছু'বছরের মতন! কবে ফেরা হ'ল শুনি ?…"

লীলার রকম দেখিয়া কিরণ ও রমলা ছু'জনেই হাসিয়া ফেলিল। তাহার এই স্বচ্ছ সরল অধিকার যেন কত যুগ হইতে বিস্তার করা আছে।

ঠিক তেমনি নিঃসঙ্কোচে লীলা মহিমের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল—"জিনিষ-পত্তর কিছুই দেখ্‌ছি না যে মহিমদা! বাইরে—"

"না রে পাগ্‌লি। এখানে তো আগে কোনদিন আসি নি ; তা ছাড়া আরো একটু জরুরি কাজ ছিল ব'লে, গোপালপুর কাছারীতে এসে উঠেছি। আজই আবার ফিরতে হবে" সহাস্যে লীলার প্রশ্নের উত্তর দিয়া মহিম মোড়ার উপর বসিয়া পড়িল।

লীলা যে উত্তরে মোটেই প্রীত হয় নাই, তাহা মহিম মুখ দেখিয়াই বুঝিল; কিন্তু কিছু বলিল না।......দুই বৎসরে লীলা মস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেহে আর সে কৈশোরের স্নিগ্ধতা নাই; যৌবনের উগ্রতায় চেহারাটা যেন একশোগুণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; তবে মনে আজো সেই অবিমিশ্র সরলতা।

জাপান হইতে ফিরিয়া মহিম দেশ-সেবায় ব্রতী হইয়াছে। রাজমহলে দাতব্য-চিকিৎসালয় ও অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া, ট্রাষ্টী করিয়াছে তটিনী আর রমলাকে। উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া, কর্ম্মভার রমলার হাতে তুলিয়া দিবার জন্যই সে বিজয়নগরে আসিয়াছিল। মহিমের মুখে সব শুনিয়া রমলা ও কিরণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তে যেন মহিম তাহাদের সমস্ত নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিরণের ইচ্ছা ছিল—সে মহিমের বিবাহ প্রসঙ্গটা একবার উত্থাপন করিয়া দেখিবে; কিন্তু কথাবার্ত্তায় মহিমকে কোন সময়ের জন্যই প্রসঙ্গের সমতলে পাইল না।

সেইদিন সন্ধ্যার পরই মহিম ফিরিবে স্থির করিল। কিরণ ও লীলা—সেদিনের মত মহিমকে আট্‌কাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল: কিন্তু হইল না। একটা বেলা নষ্ট করিবার মত সময়ের সচ্ছলতাও নাকি মহিমের এখন নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে গঙ্গার ধারে আসিয়া বসিল। আনন্দময় নিশ্চিন্ত অবসর; তবু রমলার মন দিবা-অবসানের সঙ্গে দ্রুত

অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। অতি অতর্কিত মুহূর্ত্তে মহিম আসিয়া পড়ায়, তাহার চিন্তাধারা হঠাৎ ঘোলা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মহিমের বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে রমলা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে অতৃপ্তির ফেনা উঠিতে লাগিল। এই জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত; যশ, গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ একটা আদর্শ মানুষ। মহিমের অতবড় ভবিষ্যৎকে সেই চুরমার করিয়া ভাঙিয়াছে। এই ত্যাগে তাহার সমৃদ্ধি হাজারগুণ বড় হইতে পারে: হয় তো বা সারা বাঙ্গলার অর্ঘ্য একদিন তাহার জন্যই সঞ্চিত হইবে। তবু সে যেন ভগ্ন-দেউলে চৈত্র সংক্রান্তির মতই গাজনের মহোৎসব: স্নেহহীন মমতাহীন—শুধু রাশি রাশি ভক্তির উদ্দাম কোলাহল।……মহিমের প্রাণ তখন নিশ্চয়ই হাঁপাইয়া উঠিবে; এক কণা স্নেহের জন্য—একটু প্রীতি—একটু ভালবাসা।……ভাবিতে ভাবিতে—রমলার বুকের ভিতরটা চম্‌কাইয়া উঠিল।

কিরণ যে কতবার মহিমের কাছে ক্ষমা চাহিল তাহার ইয়ত্তা নাই; তবুও তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছিল না।

শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ অজস্র আলো ছড়াইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার উচ্ছল জলস্রোতে রূপালী কল্পবালাদের মত ঘন-যৌবনা-জ্যোৎস্না যেন সাঁতার খেলিতেছে। আকাশে একটুক্‌রাও কালিমা নাই

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মহিম বলিয়া ফেলিল—"একখানি গান শোনাবে রুমি? যাবার আগে……"

গান! কি গান গাহিবে সে? তাহার প্রাণের সমস্ত সঙ্গীত তো কোন্ এক অতীত সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশেষে হারাইয়া

গিয়াছে।······অবশেষে লীলার ঘাড়ে ভার চাপাইয়া রমলা নিষ্কৃতি লইল। লীলা তাহারই ছাত্রী।

সত্যই লীলা বেশ ভাল গান শিখিয়াছে।······পুরানো স্মৃতির পাতা খুঁজিতে গিয়া মহিম চমকিয়া উঠিল : এ গান তাহারই লেখা—অনেকদিন আগে, যখন সে হঠাৎ কবি হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদায় লইবার সময় হইয়া আসিল। হঠাৎ কিরণ সমস্ত সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মহিমের হাত ধরিয়া বলিল—"একটা অনুরোধ রাখ্‌বে মহিম?"

রমলার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—কিরণ কি বলিতে চায়। তাড়াতাড়ি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"মহিম-দা, জীবনে কোনদিন কিছু চাই নি; আজ শুধু একটা ভিক্ষে চাইবো; দেবে?"

মহিম অবাক্ হইয়া কিরণ ও রমলার মুখপানে চাহিল; ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বেশ একটু আব্দারের সুরেই রমলা বলিল—"লীলাকে তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো। মন-প্রাণ দিয়ে তাকে গ'ড়ে তুলেছি—ঠিক তোমারই আদর্শে—; তোমার হাতে তুলে দিয়ে······"

"না—না, তা হয় না; হবে না—" মহিম আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া পড়িল।

লীলা রমলার পিঠের কাছটীতে বসিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া ভয়ার্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—"দাদা, বৌদির বুঝি ফিট্ হবে।"

মহিম অনেকখানি চলিয়া গিয়াছে। কিরণ লীলার কথায়

কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া ডাকিল—"মহিম,—মহিম—"

মহিম দাঁড়াইল। হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল—"মাপ ক'রো। আর নয়; ও-জগৎটা প'চে গেছে। নিতান্ত একঘেয়ে······।" হঠাৎ কি ভাবিয়া আবার দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল।

রমলা তখন সাম্‌লাইয়া লইয়াছে। তাহার হাতখানি ধরিয়া বেশ সংযত সস্নেহ-স্বরে মহিম বলিল—"আমায় ক্ষমা কর রমা; ও-সবের মধ্যে আর আমায় টেনো না। সেই কোন্ আদিযুগ থেকে স্রোত বইছে শুধু মেয়ে আর পুরুষ, পুরুষ আর মেয়ে নিয়ে। একই জিনিষ—নানা রঙে, নানা ভাবে,—একবারে আবর্জ্জনার মতই জীবনে জমে' উঠেছে। তা'তে আর নাই কিছু। তাই নিয়ে বাঁচতে গিয়ে মানুষ তিলে তিলে ম'রে যাচ্ছে। নতুন কিছু চায় সে; আরো বড়, আরো মহৎ কিছু চায়······"

মহিমের কথায় কিরণ হাসিয়া ফেলিল। তাহার ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"ভুল ক'রছিস্ মহিম, মস্ত ভুল। আদিযুগ থেকে চলে' আস্‌ছে ব'লেই সৃষ্টি আজো লোপ পায় নি। বাদ দিলে, জগৎ ঠিক এই জায়গাটিতেই থেমে দাঁড়াবে—যেভাবে আছে।"

কিরণের কথায় বাধা দিয়া মহিম জোরের সঙ্গে আবার বলিল—"তা জানি; মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ফল-ফুল, শাখা-প্রশাখা সব বাদ দিয়ে কেবল সেই মূলটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকা—জীবনের গতিও নয়, প্রগতিও নয়। যদি বল'—গতানুগতিক, তাহ'লে নিছক্ জড়তা—নিষ্ক্রিয়তা।"

"তবুও তো দরকার—অন্ততঃ সৃষ্টি রক্ষার জন্যে।"

"অস্বীকার ক'রছি না, কিরণ। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষার জন্যে যেটুকু দরকার, সেটুকু শুধু সৃষ্টির ভাণ্ডারে যত্ন ক'রে তুলে' রাখাই ভালো। তাকে জীবনে এমন ব্যাপক ক'রে তুলবার দরকার কি? 'বোসিস্' আর 'ফিলামনের' মত কেবল একটা জীবনজোড়া বাঁধন; নেহাৎ উদ্বন্ধনের মতই—।" রমলা ও কিরণ অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। কি বলিবে, তাহা যেন আর ভাবিয়া পাইতেছিল না।

মহিম যাইবার উদ্যোগ করিয়া আবার বলিল—"আদিকালের সেই একই সম্বন্ধকে নানারকম ক'রে ভাঙিয়ে বাজার চালাবার চেষ্টাটাই মানুষের দৈন্য। এমনি ক'রে মনকে দেহের খোরাক যোগাবার দিন-মজুর সাজিয়ে, দেউলিয়া ক'রে লাভ নাই। সে বাঁচতে চায়;—আরো বড়, আরো সত্য পথ সে পেতে চায়......"

তেমনি করিয়া মহিম আবার দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল, চৈত্রের দুরন্ত ঘূর্ণীর মত। পিছু ফিরিয়া চাহিবার যেন একতিলও অবসর নাই।

রমলা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিরণ সঙ্গ লইবার পূর্ব্বেই মহিম লঞ্চ খুলিয়া দিল। জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল গঙ্গার বুকে ঢেউ তুলিয়া মুহূর্ত্তে বহুদূর চলিয়া গেল। রমলার নিষ্পলক দু'টি চোখ সেই ঢেউএর পিছু পিছু সীমান্ত রেখায় গিয়া স্তব্ধ হইল। তাহার বুকের ভিতর কতকালের পুরানো একটা পাহাড়ি সুরের মূর্চ্ছনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতেছিল—"নাই—নাই—সে. পথিক নাই।"

পরিস্থিতি

মণিশঙ্করের রোগ-শয্যায় শুশ্রূষা করিবার জন্য সরোজিনী কাশী গেলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। মণিশঙ্করকে সংসারের বাঁধনে আটকাইয়া রাখিবার মত শক্তি সরোজিনীর ছিল না, আর তিনিও অবনীর জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যেন সম্মুখের পথে ছুটিয়া গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীর সব উষ্ণতা শৈত্যে ভরিয়া উঠিল।

সেই অবধি সরোজিনী কাশীতেই আছেন। তটিনী কখনো রাজমহলে, কখনো-বা কাশীতে থাকে। কিন্তু ইদানীং অনাথ-আশ্রমের ভার লইয়া, তাহার কাশী আসা প্রায় বন্ধই হইয়াছে।

সীমাহীন রিক্ততার মাঝখানে তটিনী যেন হঠাৎ নূতন করিয়া এক ছায়াস্নিগ্ধ শান্তি-নিকেতনের সন্ধান পাইয়াছে— অনাথ-আশ্রমের কার্য্যভার হাতে লইয়া। মাতৃহীন ছেলে-মেয়েগুলি যখন সরল স্বাধিকারে তাহাকে ঘিরিয়া আনন্দ-কোলাহল করে, জীবনের বঞ্চিত মাতৃত্বটুকু সার্থকতার গৌরবে দুলিয়া উঠে ; মনের সব গ্লানি মুহূর্ত্তে মুছিয়া যায়।

মেনকারও শেষ-জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে ওই অনাথ-আশ্রম। আজ আর তাঁহার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, কাহারো প্রতি কোন অভিযোগ নাই। শুধু সেবা ও কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া, মেনকা জীবনের পরিমিত অবশেষটুকু পূর্ণ করিবার জন্য যেন আকুল আগ্রহে এই প্রতিষ্ঠানটি জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

সম্মুখের পথে যাহাদের নূতন করিয়া কিছু পাইবার আশা ফুরাইয়া গিয়াছে, পিছনের পথে যাহাদের পড়িয়া আছে শুধু ব্যর্থতার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আর পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপ, এমনি করিয়াই তাহারা আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে,—অন্যের অন্ধকার পথে জীবনের অবসন্নপ্রায় ক্ষীণ প্রদীপটি তুলিয়া ধরিবার জন্য তাহাদের প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে।

ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া দিন যেমন চলিতেছিল, আজিও তেমনি চলে। সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্না পথের পাশে তেমনি করিয়া আজিও লুটোপুটি করে; জীবনের পথে যাহারা চলন্ত পথিক, তাহারা শুধু চলে—।

বিচিত্র গতিতে আরো তিনটী বৎসর কাটিয়া গেল।

সিউরী জেল,
১লা শ্রাবণ, ১৩৪১

প্রীতিনিলয়াসু—

ভাই সুনন্দা, তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দু'একদিন দেরী হ'ল ব'লে, মনে কিছু ক'রো না। খোকা এখন খুব হাস্‌তে শিখেছে, বেশ খেলা ক'রতে পারে আর আধো-আধো অনেক কথা বলে—শুনে' সত্যি অপার আনন্দ হ'চ্ছে। তোমরা তখন ব'লেছিলে—খোকা তোমাদের কাছে থাকতে পারবে না। কিন্তু এখন বোধহয় বেশ বুঝতে পারছো যে, সে তার মায়ের কথা একদম ভুলে' গেছে। খোকাকে আমি সঙ্গে আনি নি ইচ্ছা ক'রেই; কারণ আমি যে আর ফিরবো না, সে কথা জেনেই এসেছি। তা-ই আমার কামনাটুকু মিটিয়ে এসেছি তাকে তোমার কোলে তুলে' দিয়ে। খোকা তোমার হ'য়ে, চিরদিন তোমার কোলেই থাক্, এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে বার-বার জানাচ্ছি।

হাঁ, আর এক কথা নন্দি, খোকা যে তার কচি দু'টি হাতে তোমার মত কঠোর ব্রতচারিণীকেও আকর্ষণ ক'রে ফেলেছে, তার জন্যে তাকে অশেষ ধন্যবাদ আর আশীর্ব্বাদ না জানিয়ে পারছি না। যাঁর জন্যে তোমার কৃচ্ছ্রসাধন, তাঁর কোনো খবর যদি পেয়ে থাকো, জানিয়ো। লীলার খবরও অনেকদিন পাই নি।

খোকার নাম-করণ হ'চ্ছে না বলে' তোমার অত দুঃখ? তুমি নিজেই তো ইচ্ছামত তোমার ছেলের একটী নাম রাখলেই পারতে। যাক্, আমার উপরেই যখন সে ভার দিয়েছ, আমি

সাধ্যমত তাঁর সম্মান রাখ্তে ত্রুটি ক'রবো না। খোকার নাম রেখো—"মন্দার"। আশাকরি তোমারও এ নাম অপছন্দ হবে না।

খোকা যে দেবলোকের নির্ম্মাল্যের মতই এসেছে, তাতে সন্দেহ নাই; তবে তার 'মন্দার' নাম কেবল তাই ভেবেই রাখ্তে চাচ্ছি না। আরো একটু ইতিহাস তার নামের সঙ্গে আমি জড়িয়ে দিতে চাই।

যাঁর আদর্শ আমি খোকার জীবনে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তাঁরই নামের আদ্য অক্ষরটী;—আর খোকার যে নতুন মা ঠিক সেতুবন্ধের মতই দু'টি বিচ্ছিন্ন তীরকে এক ক'রেছেন, তাঁর নামের শেষ অক্ষর ভিক্ষা নিয়ে, স্নেহের পুতুলটীকে স্মৃতির একগাছি ছোট মালা পরাবার আকাঙ্ক্ষা মনে খুব প্রবল হ'ল ব'লেই হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেল্লাম—"মন্দার"।

খোকা বড় হ'লে, তাকে তুমিই বুঝিয়ে দিও। আমি তার অনেক আগে যে বিদায় নেবো, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যা সন্দেহ ছিল, তা কাল ডাক্তার প্রতিপন্ন ক'রে গেছেন।

তোমরা আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ নিও। খোকাকে আমার স্নেহ-চুম্বন দিও। ইতি—

তোর দিদি
রমলা।